সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র
চতুর্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ● মার্চ ২০১৮ ● পাঁচ টাকা

ঘরের সব করেও যে পর!

মেয়েটির নাম স্বপ্না আক্তার। হয়তো জন্মের সময় তাকে ঘিরেই ডানা মেলেছিল বাবা-মায়ের স্বপ্ন। তাই নাম রেখেছিল স্বপ্না। কিন্তু সেই স্বপ্ন ফিকে হতে সময় লাগেনি বেশি। দিনে দিনে আর্থিক অনটনে ভালো স্বপ্নগুলো ধূসর হয়ে যায়। একদিন বাবার হাত ধরে কিশোরগঞ্জের ভৈরব থেকে ঢাকায় *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

দমন-পীড়ন চালিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চায় সরকার

দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে গত এক মাস ধরে কারাগারে আছেন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া। এই মামলার রায় যেদিন হয়, সেদিন ঢাকা শহরকে মনে হয়েছিল পুলিশের শহর। বিভিন্ন পয়েন্টে পয়েন্টে তল্লাশি চৌকি। সাধারণ মানুষ ভোগান্তির একশেষ হয়েছিল সেদিন। দেশের বিভিন্ন জায়গায় গ্রেপ্তার হয়েছিল বিএনপি'র বহু নেতা-কর্মী। পরবর্তীতে ধরপাকড়, নির্যাতন, গ্রেপ্তার থামেনি। বরং এখন বিএনপি'র যেকোনো কর্মসূচি মানেই পুলিশের আক্রমণাত্মক মেজাজ। বিএনপি নেত্রীর গ্রেপ্তার হবার এক মাসের মধ্যে যে ১৩টি কর্মসূচি পালন করেছে তারা, প্রত্যেকটিতেই পুলিশের ছিল ব্যাপক মারমুখী অবস্থান।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বিএনপি কার্যালয়ের সামনে কালো পতাকা ও মিছিলের কর্মসূচি ছিল। এ কর্মসূচি পুলিশ করতে দেয়নি। ব্যাপক লাঠিচার্জই কেবল করেনি, গ্রেপ্তারও করেছে প্রায় অর্ধশত নেতা-কর্মীকে। গত ৬ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধনের মতো কর্মসূচিতেও গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) অস্ত্র উঁচিয়ে এমন তৎপরতা চালিয়েছিল যে চারপাশে ব্যাপক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গত ৮ মার্চ বিএনপি সারা দেশে এক ঘন্টার অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। এ কর্মসূচিও পুলিশের বাধায় পণ্ড হয়েছে। সম্প্রতি রিমান্ড শেষে কারাগারে মারা গেছেন ছাত্রদল মহানগর উত্তরের সহ-সভাপতি জাকির হোসেন মিলন। এমনকি লিফলেট বিতরণের মতো কর্মসূচিও সরকার করতে দিচ্ছে না।

'জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট' মামলায় বিএনপি নেত্রীর সাজা দিয়েছে আদালত। দুর্নীতি করলে তার সাজা হবে – ব্যাপারটা এমন নিয়মতান্ত্রিক হলে হয়তো কিছুই বলার থাকত না। কিন্তু এই সরকার আইন-আদালত-বিচার ব্যবস্থা সবগুলোকে এমন বিতর্কিত করেছে যে তা আর বলা যাচ্ছে না। আইন-আদালত সব যেন বিরোধী দল দমন করার জন্য। যেমন, নিয়মিত বিরতিতে সরকারি দলের অনেক মন্ত্রী-এমপিদের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির শক্তপোক্ত প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কোনোটিরও বিচার হয়নি। সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যত্ব থাকে না এমন আওয়ামী লীগ নেতা বহাল *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মধ্যম আয়ের অর্থনীতিতে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস!

ভূমিকম্প অনেকটা ঢেউয়ের মতো আঘাত করে। পানিতে যেমন বড় ঢেউ আসার আগে ছোট ছোট ঢেউ আসে, ভূমিকম্পেও তেমনি। প্রথমে কয়েকটি মৃদু ধাক্কা, তারপর বড় ঝাঁকুনি। বাংলাদেশেও মাঝে মাঝে ছোট-বড় ভূমিকম্প আঘাত হানে। অচিরেই এদেশে একটা বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা ঘনীভূত হয়েছে। তবে সেটা ভূমিতে নয়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে। এরই মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট ধাক্কা দিয়েছে ব্যাংকিং খাতে। আগামীতে বড় ঝাঁকুনির আশঙ্কা বিশ্লেষকদের।

বাংলাদেশকে যখন কথিত 'মধ্যম আয়ের' দেশের কাতারে তোলার কৃতিত্ব প্রচার করছে বর্তমান আওয়ামী মহাজোট, ঠিক সে সময়েই এই আশঙ্কা। এবং এই সংকট কেন্দ্রীভূত হয়েছে ব্যাংকিং খাতকে ঘিরে। একের পর এক ঋণ কেলেঙ্কারির মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতকে দেউলিয়া অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। বেসিক ব্যাংকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঋণ কেলেঙ্কারি, জনতা ব্যাংকের ঋণ কেলেঙ্কারি, ফারমার্স ব্যাংকের নজরকাড়া অনিয়ম, এনআরবিসি ব্যাংকের দৃশ্যমান অনিয়ম, সোনালী ব্যাংকের হলমার্ক-কাণ্ড, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরিসহ সব কেলেঙ্কারি ব্যাংকিং খাতকে অস্থির করে তুলেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ইসলামী ব্যাংকসহ কয়েকটি ব্যাংক দখলের ঘটনা। সব মিলে ব্যাংকিং খাতে এত অস্থিরতা দৃশ্যমান হয়নি কখনও।

এক-চতুর্থাংশ ব্যাংক বেহাল দশায়

২০১৭ সাল ছিল ব্যাংক লুটের বছর, ব্যাংক দখলের বছর। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে খেলাপি ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ হাজার কোটি টাকার বেশি। এর সঙ্গে অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ যোগ করলে এটা ১ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়।

দেশে সরকারি-বেসরকারি-বিদেশি মিলে মোট ব্যাংক রয়েছে ৫৭টি। এর মধ্যে ঋণ কেলেঙ্কারিসহ অনিয়ম-দুর্নীতিতে ১৩টি ব্যাংকের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। যার মধ্যে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ও বিশেষায়িত ব্যাংকই আটটি। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ কমার্স, ন্যাশনাল, ফারমার্স ও এনআরবি কমার্শিয়ালে পরিস্থিতি কয়েক বছর ধরে খারাপ হচ্ছে। এ ছাড়া এক যুগ আগে বিলুপ্ত হওয়া ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের দুর্নীতির বোঝা এখনো টেনে চলেছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক। এমনকি দুই বছর ধরে এই ১৩ ব্যাংকে পর্যবেক্ষক বসিয়েও পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না। বাকি বেসরকারি ব্যাংকগুলোর বেশির ভাগের অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। ব্যাংকগুলো দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেদের রিজার্ভ থেকে পাচার হওয়া অর্থই উদ্ধার করতে পারেনি, উপরন্তু ব্যাংকগুলোর নজরদারিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বেসরকারি খাতের একাধিক ব্যাংকের মালিকানা বদল নিয়ে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটলেও এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপই নেয়নি বাংলাদেশ ব্যাংক। উল্টো কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাতে সায় দিয়েছে। ফলে ব্যাংক খাতের আমানতকারীসহ সংশ্লিষ্ট *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

স্বাধীনতার ৪৭ বছর
গণতন্ত্র কতদূর?

২৬ মার্চ, দেশ পদার্পণ করবে তার ৪৭ তম স্বাধীনতা দিবসে। স্বাধীনতা দিবস প্রতিবারের মতো এবারেও উদযাপিত হবে মহাআড়ম্বরে। সেদিন ভাষণ হবে, স্মৃতিসৌধে লাইন ধরে ফুল দেবে মানুষ, শহরের বড় বড় ভবনগুলো সাজবে লাল-নীল বাতিতে। স্বাধীনতার দিন যায় আবার আসে! এভাবেই আসে যায় করে স্বাধীনতার ৪৬টি বছর আমাদের কেটে গেল! ৪৭ তম স্বাধীনতা দিবসে আমরা নিজেকে প্রশ্ন করি, কী পেলাম আমরা? গণমানুষের ভাগ্যের কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছে এতদিনে?

স্বাধীনতা সংগ্রামকে আওয়ামী লীগ, বিএনপি কিংবা অন্যান্য বুর্জোয়া দল ও তাদের বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে ব্যাখ্যা করেন – ইতিহাসটা মোটেও সেরকম নয়। ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের সকলে একই উদ্দেশ্য নিয়ে লড়েনি। বাংলাদেশের এই মুক্তি সংগ্রামে একদিকে ছিল শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত, ছাত্রসহ সর্বস্তরের শোষিত মানুষ, অন্যদিকে ছিল বাংলাদেশের উদিয়মান বুর্জোয়াশ্রেণি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই দুই শ্রেণির লক্ষ্যও ছিল ভিন্ন। শোষিত মানুষের লক্ষ্য ছিল সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তিলাভ, আর উঠতি বুর্জোয়াশ্রেণি, যারা স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের লুটের বাজারে নগণ্য হিস্যাদার ছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল কোনোরকমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতাটি দখল করার মাধ্যমে সেই বাজারে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।

বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণি এই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় বুর্জোয়া শ্রেণির দল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের মাধ্যমে দেশের বুর্জোয়া শ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে এবং এখানে একটি স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মের পরপরই এই দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে, যা সেসময়ে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পুঁজিবাদী দেশগুলি অনুসরণ করত। স্বাধীনতার পর দেশের বড় বড় শিল্প কারখানাগুলো জাতীয়করণ করা হলেও উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদকে আরও সংহত করা। দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তিপুঁজির পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে কমিয়ে সামগ্রিকভাবে জাতীয় পুঁজির *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

প্রশ্নফাঁস আর পরীক্ষার চাপে শৈশব-কৈশোর আজ অন্ধকারে

ক'দিন আগে শেষ হলো এসএসসি পরীক্ষা। পরীক্ষার আগে থেকেই সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধের দাবিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ চলছিল। পুরাতন ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে কথা হচ্ছিল এক অভিভাবকের সাথে। তাঁর সন্তান এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে তাঁর মন্তব্য জানতে চাইলে দুঃখ করে বললেন, 'কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে লজ্জা লাগে, আমার সন্তান এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে'। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। এ অবস্থায় একজন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ কষ্ট পাবেন – সেটাই স্বাভাবিক। রাজধানীর একটি হাইস্কুলের একজন শিক্ষক বললেন, 'আমাদের খাতায় বেশি *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মধ্যম আয়ের অর্থনীতিতে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস!

(১ম পৃষ্ঠার পর) ব্যক্তিদের মধ্যে একধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে।

বেসিক থেকে শুরু

বেসিক শব্দের মানে হল ভিত্তি। সেই ভিত্তি থেকেই কম্পন শুরু হয়েছে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে। পরের ঝাঁকুনিটি টের পাওয়া গেল সোনালী ব্যাংকের হলমার্ক কেলেঙ্কারির মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চোখের লাভজনক ব্যাংকটি প্রায় দেউলিয়া হতে বসেছে।

২০০৯ সালে শেখ আবদুল হাই বাচ্চু ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের সময় খেলাপী ঋণ ছিল মাত্র ৬ ভাগ। বাচ্চুর নেতৃত্বে ভূয়া গ্রাহকের নামে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা লোপাট চলতে থাকে। ফলাফল ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪ শতাংশে, টাকার অংকে প্রায় ৭ হাজার ৪শ কোটি টাকা। ঋণ লুটপাটের ঘটনায় ৫৬টি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এর কোনোটিতেই আসামি করা হয়নি ব্যাংকটির তৎকালীন চেয়ারম্যান আবদুল হাই বাচ্চুকে। গণমাধ্যমের চাপে দায় এড়াতে সম্প্রতি বাচ্চুকে তলব করে দুদক।

এক গ্রাহকেই ডুবেছে জনতা ব্যাংক

সবধরনের নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা না করে এনোনটেক্স নামে সাধারণ কোম্পানিকে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংক। ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুযায়ী একজন গ্রাহককে ব্যাংকের মূলধনের সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ ঋণ দিতে পারে। সেই হিসেবে ৭৫০ কোটি টাকা ঋণ দেয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের নেতৃত্বে অখ্যাত এনোনটেক্স এর ২২ প্রতিষ্ঠানের নামে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেয় জনতা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ। যা ব্যাংকিং খাতে নজিরবিহীন কেলেঙ্কারি। পর্ষদের বেশ কয়েকজন সদস্য ছিলেন যারা সরাসরি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। কিন্তু এখন পর্যন্ত জনতা ব্যাংকের তখনকার চেয়ারম্যানসহ কোনো পরিচালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দুদক।

ইউনুস বাদলের কোম্পানির নামে বিতরণকৃত ঋণ দেয় জনতা ভবন করপোরেট শাখা। ব্যাংকটির বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুছ সালাম আজাদ সে সময় ভবন শাখার মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্বে ছিলেন। পরিচালনা পর্ষদে ঋণের প্রস্তাব পাঠানোর কাজটি তিনিই করেছিলেন। ফলে ঋণ আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না দেখে অনুমোদনের জন্য পাঠানোয় দায় বর্তায় তার উপরেই। অথচ গুরুতর এই অভিযোগের কারণে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বদলে পুরস্কার হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বানিয়েছে সরকার। ভবিষৎ দুর্নীতির পথ খোলা রাখতেই তাকে এমডি করার অভিযোগ আছে। নামে এনোনটেক্স থাকলেও ঋণ লোপাটের পেছনের সুবিধাভোগী সরকার দলীয় কেউ কেউ বলে কথা শোনা যায়।

সোনালী ব্যাংকের হলমার্ক কাণ্ড

দেশের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের হলমার্ক কেলেঙ্কারির অভিনব সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার বিষয়টি সবারই জানা। দুদকের জিজ্ঞাসাবাদে সোনালী ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দ মোদাচ্ছের আলীর নাম জানিয়েছে। (প্রথম আলো, ৩১-০৮-২০১২) এছাড়া সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদে ছাত্রলীগের সাবেক নেতা সুভাষ সিংহ রায়, স্বেচ্ছাসেবক লীগের আন্তর্জাতিক-বিষয়ক সম্পাদক সাইমুম সরওয়ার কামাল এবং মহিলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক জান্নাত আরা হেনরি ছিলেন। এছাড়া পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন সাংবাদিক কাশেম হুমায়ুন ও আওয়ামী লীগ নেতা সত্যেন্দ্র চন্দ্র ভক্ত। বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষণ হলো – হলমার্ক গ্রুপের অখ্যাত অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ পাইয়ে দিতে এসব পরিচালক সহায়তা দিয়েছেন। একই সাথে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে ঋণ পেল তা দেখভাল করার ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বলে মনে করছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

নতুন প্রজন্মের ব্যাংক দুর্নীতির অভিনব নজির স্থাপন করেছে

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সরকারি হিসাব-সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা মহীউদ্দীন খান আলমগীরের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফারমার্স ব্যাংক। তারা দাবি করেছিলেন, এ হবে নতুন প্রজন্মের ব্যাংক। কিন্তু প্রতিষ্ঠার তিন বছর পার হতে না হতেই ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে। আর ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে ফারমার্স ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও পরিচালক পদ ছাড়তে হয়েছে ম. খা. আলমগীরকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধান অনুযায়ী প্রচলিত ধারার কোনো ব্যাংক তার আমানতের ৮৫ শতাংশের বেশি ঋণ দিতে পারে না। তবে সেই নির্দেশনা উপেক্ষা করে ফারমার্স ব্যাংক ৯৭ শতাংশ ঋণ বিতরণ করেছে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে আমানতকারীদের দায় পরিশোধেরও ক্ষমতা হারিয়েছে ব্যাংকটি।

এখন ডুবন্ত ফারমার্সকে টাকার যোগান দিতে সরকার ও ব্যাংলাদেশ ব্যাংক মিলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে চাপ দিচ্ছে। ইতোমধ্যে, বেসরকারি ব্যাংকটিকে বাঁচাতে সরকারি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নিয়ে সভা করেছে খোদ নিয়ন্ত্রক সংস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

আওয়ামী মহাজোট সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুমোদন পাওয়া ৯টি ব্যাংকের একটি ফারমার্স ব্যাংক। একই দশা একইভাবে অনুমোদন পাওয়া এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকেরও। এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ফরাছত আলী।

দখল, অর্থ পাচার ও খেলাপি ঋণের ভার

এদেশের ব্যাংকিং খাতে নতুন উপসর্গ হলো ব্যাংক দখল। বিশেষ ব্যবস্থায় গত বছরের জানুয়ারিতে ইসলামী ব্যাংক এবং অক্টোবরে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের মালিকানা দখলে নিয়েছে চট্টগ্রামভিত্তিক এস. আলম গ্রুপ। এর আগে ২০১৬ সালে বিকল্পধারা বাংলাদেশের মহাসচিব আবদুল মান্নানের শেয়ার কিনে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নেয় গ্রুপটি। যদিও তাতে ব্যাংকটির উন্নতি হয়নি। বর্তমানে ব্যাংকটির মোট ঋণের ৩৪ শতাংশই খেলাপি। ইসলামী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ এস. আলম গ্রুপের হাতে যাওয়ার পর ব্যাংকটির আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে। আর যে এস. আলম গ্রুপ একের পর এক ব্যাংক দখল করছে সেই গ্রুপটি নিজেরাই বিরাট অংকের খেলাপী ঋণের বোঝা বহন করছে।

ন্যাশনাল ব্যাংকের খেলাপি ঋণ গত জুন (২০১৭) পর্যন্ত হয়েছে ২ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকা, যা মোট দেওয়া ঋণের প্রায় ১১ শতাংশ। খেলাপি গ্রাহকদের থেকে ব্যাংক কোনো অর্থ আদায় করতে পারছে না, আইনি ব্যবস্থাও নিতে পারছে না।

নিয়ন্ত্রণহীন খেলাপি ঋণ

২০১৭ সালের প্রথম দিকে ব্যাংকে ছিল উপচেপড়া তারল্য। ব্যাংকাররা এই অতিরিক্ত টাকা নিয়ে কী করবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। এক বছরের মাথায় নগদ টাকার সংকটে ব্যাংকিং খাতে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা। কোথায় গেল এত টাকা? কাদেরকে দেওয়া হলো এত টাকা, যা আর ফেরত আসছে না? বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বর শেষে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ হাজার ৩০৭ কোটি টাকা। এর সঙ্গে ঋণ অবলোপন (আদায়যোগ্য নয় বলে হিসেবে থেকে বাদ দেয়া) করা ৪৫ হাজার কোটি টাকা যোগ করলে ব্যাংকিং খাতে প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় এক লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা। বিশ্লেষকরা বলছেন, খেলাপি ঋণের এই নিয়ন্ত্রণহীন পরিস্থিতি পুরো অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করতে পারে।

অনেকে মনে করছেন, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর পরিচালকরা নিজেদের মধ্যে ঋণ ভাগাভাগি করছেন। ঋণের অর্থ পাচারও হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, পরিচালকদের ঋণ ভাগাভাগির পরিমাণ এক লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।

গত জানুয়ারি মাসে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত জাতীয় সংসদে প্রায় দুই হাজার ঋণখেলাপির যে তালিকা প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যায়, ১০ কোটি টাকার উপর ব্যাংকঋণ নিয়ে আর ফেরত দেননি এমন প্রায় দুই হাজার গ্রাহকের মধ্যে ৬০০-এর মতো বস্ত্র ও পোশাক খাতের। বড় অংকের খেলাপি ঋণ রয়েছে, এমন শীর্ষ ১০০ গ্রাহকের মধ্যেও বস্ত্র ও পোশাক খাতের ব্যবসায়ীদেরই আধিক্য। ঋণখেলাপি শীর্ষ ১০০ গ্রাহকের মধ্যে প্রায় ৪৪ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানই এ খাতের। আর প্রথম ৫০০ ঋণখেলাপি বিবেচনায় নিলে এর মধ্যে বস্ত্র ও পোশাক খাতের গ্রাহক সংখ্যা ১৫৭। *(দৈনিক বণিকবার্তা, ২৮ জানুয়ারি ২০১৮)*

সংকটের আশঙ্কা : বাস্তব নাকি অমূলক?

এই যে বড় ধরনের আর্থিক সংকটের আশঙ্কার কথা বলা হচ্ছে – এটা কি বাস্তব নাকি অমূলক আশঙ্কা মাত্র? আমাদের এই আশঙ্কার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে গত ১২ ফেব্রুয়ারি দৈনিক প্রথম আলোর একটি প্রতিবেদন থেকে। এতে বলা হয়েছে, "দেশের ব্যাংক খাতে হঠাৎ করেই ঋণ দেওয়ার মতো অর্থের টান পড়েছে। বেশ কিছু ব্যাংক নতুন করে ব্যবসায়ীদের ঋণ দিচ্ছে না। প্রায় সব ব্যাংকই বাড়িয়েছে সুদের হার। এমনকি কিছু ব্যাংকের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের দেওয়া ঋণের টাকা ফিরিয়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটছে।" প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, "ব্যাংকাররা হঠাৎ এই সংকটের পেছনে কয়েকটি কারণ দেখছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো ব্যাংকের আমানতের বিপরীতে ঋণ বিতরণের সীমা কমিয়ে দেওয়া। এ ছাড়া সুদের হার কম হওয়ায় ব্যাংকে আমানত কমে যাওয়া, ডলার বিক্রি করে ব্যাংক থেকে অর্থ তুলে নেওয়া এবং বেসরকারি একটি ব্যাংকের সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারিও পরোক্ষভাবে এ সংকটে ঘি ঢেলেছে।"

ব্যাংক লুটের রাজনীতি!

সোনালী ব্যাংকের অনিয়ম ও ঋণ জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর সে সময় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, বেসিক ব্যাংকে হয়েছে উচ্চপর্যায়ের মাধ্যমে দুর্নীতি। আর সোনালী ব্যাংকে হয়েছে বড় ধরনের ডাকাতি। *(দৈনিক প্রথম আলো, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)* কিন্তু সেই ডাকাতির বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি, অর্থমন্ত্রী কথিত সেই ডাকাতের বিচারের আওতায় আনাও হয়নি। ফারমার্স ব্যাংকের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতারাই ব্যাংকটিকে লুটপাট করে শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে কি কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? উত্তর হলো - না।

বণিক বার্তা ২০১৭ সালের ২ জুন এক হিসাব তুলে ধরে জানায়, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত আট বছরে ১৪ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা দিয়েছে সরকার। এরপরও ২০১৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৭০১ কোটি টাকার মূলধন ঘাটতিতে ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সাতটি ব্যাংক। এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এই সংকটের কারণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। এসব ব্যাংকেও বছরের পর বছর পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং তাঁরা ঋণও দিয়েছেন রাজনৈতিক তদবিরে ও প্রভাবে। এসব ব্যাংকের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে উদ্যোক্তা, চেয়ারম্যান, পরিচালনা পরিষদের সদস্য এবং সরকারের নেতা-নেত্রী বা ঘনিষ্ঠজনরা মিলে ব্যাংকগুলোকে দেউলিয়া বানিয়ে চলেছেন।

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া এখন কারাবন্দি। এতিমখানার নামে ২ কোটি ১০ লাখ টাকা ব্যক্তিগত একাউন্টে সরিয়ে নেয়ার অভিযোগে সাজা হয়েছে, আর্থিক জরিমানা হয়েছে খালেদা জিয়াসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখে সোচ্চার বর্তমান সরকার অথচ সরকার দলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দেশে হাজার হাজার কোটি টাকার অনিয়ম, দুর্নীতি এবং লুটপাটের খবর তুলে ধরছে সংবাদ মাধ্যম।। খুব সঙ্গত কারণেই মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে, দুই কোটি টাকার অনিয়মের জন্য যদি সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে ৫ বছর জেল খাটতে হয় তাহলে হাজার কোটি টাকা অনিয়মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্তদের বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে না কেন? স্পষ্টতই বিষয়টি রাজনৈতিক, দলীয় স্বার্থ ও ভাগাভাগির বিষয়। এ অবস্থা যদি চলতে থাকে, তাহলে ব্যাংকিং খাতকে রক্ষা করা তো যাবেই না বরং ব্যাংকিং খাতের আপাত মৃদু ভূমিকম্প ধীরে ধীরে গোটা অর্থনীতিকে আঘাত করবে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। এটা অনিবার্য।

মিরপুর বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করতে হবে

বস্তি এবং বস্তিবাসী মানুষগুলো তিলোত্তমা রাজধানীতে বড়ো বেশি বেমানান। এজন্যেই বস্তিতে আগুন লাগে। আসলে আগুন লাগানো হয়। বস্তির পোড়া মাটিতে পরবর্তীতে দৃষ্টিনন্দন ইমারত নির্মিত হয়।

মিরপুর-১২ নম্বর সেকশনের ইমতিয়াজ আলী বস্তিতে গত ১২ মার্চ ভোরে আগুন লেগেছে। সর্বস্ব হারিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। তা নিয়ে এ রাষ্ট্রের কোনো মাথাব্যথা নেই। কখনও ছিলো না। কারণ, রাষ্ট্রটি বস্তিবাসী গরীব মানুষদের নয়। রাষ্ট্রটা যাদের, সে বিত্তবানদের দখলে যাবে বস্তির জায়গা। রাষ্ট্রের উপর গরীব মানুষদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা না গেলে, এভাবে বার বার তাঁরা উচ্ছেদ হবেন, তাঁদের ঘরে আগুন লাগবে।

বাসদ (মার্কসবাদী), মিরপুর থানা শাখা সীমিত সাধ্য নিয়ে সব খোয়ানো বস্তিবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছে। জনগণের কাছে অর্থ সংগ্রহ এবং বস্তিতে খাদ্য বিতরণ করেছে। একইসাথে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করতে সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছে।

মার্কস স্মরণে

পল লাফার্গ

[এ বছর সর্বহারা শ্রেণির মুক্তি সংগ্রামের পথপ্রদর্শক মহান কার্ল মার্কসের ২০০তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে বছরব্যাপী মার্কসের জীবন সংগ্রাম ও তাঁর অবদান নিয়ে সাম্যবাদে ধারাবাহিক লেখা ছাপানোর অংশ হিসেবে এবারের সংখ্যায় পল লাফার্গের ভাষ্যে কার্ল মার্কসের জীবনযাপনের কিছু দিক তুলে ধরা হলো। ব্যক্তিজীবনে কার্ল মার্কস মানুষটি কেমন ছিলেন, কী তিনি ভালোবাসতেন, প্রতিদিনের জীবনযাপনে কীভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন – তা-ই অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন লাফার্গ। স্থানের সীমাবদ্ধতার জন্য কিছুটা সংক্ষেপিত করে দুই পর্বে আমরা লেখাটি ছাপাচ্ছি। পল লাফার্গ (১৮৪২-১৯১১) ছিলেন ফ্রান্সের এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা, ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, মার্কস ও এঙ্গেলসের বন্ধু ও প্রিয় শিষ্য এবং মার্কসের কন্যা লারা মার্কসের স্বামী। লেখাটি আমরা পেয়েছি এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) র ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ'র চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (এপ্রিল ২০১৩) থেকে।]

মানুষ ছিলেন তিনি, দোষেগুণে যথার্থ মানুষ,
অমন মানুষ আমি এ-জীবনে দেখব না কখনও।
[শেক্সপীয়র, 'হ্যামলেট', প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

আমার বয়স তখন ২৪ বছর। ওই প্রথম দর্শন আমার মনে সে সময়ে যে- রেখাপাত করেছিল যতদিন বাঁচব তা অক্ষুণ্ন থাকবে। মার্কসের শরীর তখন ভালো যাচ্ছিল না। 'পুঁজি' বইটির প্রথম খণ্ডটি লিখছিলেন তিনি। খণ্ডটি অবশ্য তার পরেও দুই বছর, অর্থাৎ ১৮৬৭-র, আগে প্রকাশিত হয়নি। আরব্ধ কাজ শেষ করে যেতে পারবেন না ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন তিনি, আর তাই অল্পবয়সী মানুষজন দেখা করতে এলে ভারি খুশি হতেন। উনি তখন প্রায়ই বলতেন, 'আমার পরেও যাতে কমিউনিস্ট প্রচার চালানো সম্ভব হয় তার জন্যে লোকজনকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে আমায়'।

কার্ল মার্কস ছিলেন সেই ধরনের বিরল ব্যক্তিদের একজন যিনি একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও জনজীবনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ ছিলেন। এই দুটো দিক তাঁর মধ্যে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে একমাত্র বিদ্বজ্জন ও সমাজতন্ত্রী যোদ্ধা-এই দুই চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে হিসেবের মধ্যে ধরলে তবেই তাঁকে বোঝা সম্ভব।

মার্কসের মত ছিল এই যে, গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফল কী হবে তার পরোয়া না রেখেই বিজ্ঞানের চর্চা চালিয়ে যাওয়া উচিত। তবে, তিনি এটাও মনে করতেন যে, সমাজজীবনে সক্রিয়ভাবে যোগদান না করা কিংবা রেশমের মধ্যে গুটিপোকার মতো নিজেকে পড়ার ঘরে ল্যাবরেটরিতে আবদ্ধ রাখা এবং সমকালীন জীবন, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, বিজ্ঞানীর পক্ষে আত্ম-অবমাননা ছাড়া কিছু নয়। মার্কস বলতেন, 'বিজ্ঞানচর্চাকে স্বার্থপর আনন্দ-উপভোগে পরিণত করা ঠিক নয়। বিজ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করার মতো সৌভাগ্য অর্জন করেছে যারা, অর্জিত জ্ঞানকে মানুষের সেবায় তাদেরই সর্বপ্রথম কাজে লাগানো উচিত।' তাঁর একটি প্রিয় কথাই ছিল 'মানুষের জন্য কাজ কর'।

শ্রমিক শ্রেণির দুঃখকষ্টের জন্যে যদিও তাদের প্রতি মার্কসের সহমর্মিতা ছিল গভীর, তবু কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করেছিলেন তিনি ভাবাবেগ আপ্লুত হয়ে নয়, বরং ইতিহাস ও রাজনীতি-সংক্রান্ত অর্থশাস্ত্রের চর্চার ফলেই। তিনি বলতেন, পুঁজিবাদী স্বার্থের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং শ্রেণিগত কুসংস্কারে অন্ধ নয় এমন যেকোনও পক্ষপাতশূন্য মনকে অবশ্যই এই এক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।

সে যাই হোক, পূর্বনির্ধারিত কোনো মতামত পোষণ না করে মানবসমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের অনুধাবনে রত থাকার সময়ে কলম ধরার পিছনে মার্কসের অপর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল তিনি চেয়েছিলেন গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলি প্রচার করতে এবং যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন তখনও পর্যন্ত কল্পস্বর্গ স্থাপনের স্বপ্নবাষ্পে আচ্ছন্ন ছিল, তাকে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যুগিয়ে দেওয়ার দৃঢ়সংকল্পই ছিল তাঁর অবলম্বন। যে শ্রমিকশ্রেণির ঐতিহাসিক ব্রত হলো সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব অর্জনের পরে পরেই কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা, একমাত্র সেই শ্রেণির বিজয়কে অগ্রসর করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সেই মতামত প্রকাশ্যে প্রচার করেছিলেন তিনি।

যে দেশে জন্ম নিয়েছিলেন একমাত্র সেই দেশে নিজ কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ রাখেননি মার্কস। তিনি বলতেন, 'আমি হচ্ছি বিশ্ব-নাগরিক। যেখানেই থাকি না কেন সেইখানেই আমি সক্রিয়।' অবশ্য মেটল্যান্ড পার্ক রোডের বাড়িতে পড়ার ঘরে সেদিন প্রথম যাঁকে দেখি তিনি অক্লান্ত ও অতুলনীয় সমাজতন্ত্রী প্রচারক নন, বরং বলা যায়, ধ্যানী বিজ্ঞানী। ওই পড়ার ঘরটি ছিল সেই কেন্দ্র যেখানে সভ্য জগতের দূরদূরান্তের সকল অঞ্চল থেকে পার্টি-কমরেডরা আসতেন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাগুরুর মতামত জানতে। মার্কসের মানসিক জীবনের অন্তরঙ্গতায় প্রবেশ করতে হলে এই ঐতিহাসিক ঘরখানির পরিচয় আগে জানা দরকার।

ঘরখানা ছিল বাড়ির দোতলায়। টানা একটা জানলা দিয়ে আলো এসে ভরে দিত ঘরখানা। জানলা দিয়ে চোখে পড়ত পার্কের দৃশ্য। জানলার বিপরীত দিকে ঘর গরমের চুল্লীর দু'পাশে দেয়াল জুড়ে ছিল বইয়ের তাক। তাকগুলো ছিল বইয়ে ভরা আর ছাদ পর্যন্ত উঁচু হয়ে ওঠা খবরের কাগজ পাণ্ডুলিপিতে ঠাসা। চুল্লীর বিপরীত দিকে জানলার একপাশে থাকত দুটো টেবিল, তার উপর কাগজপত্র, বই আর খবরের কাগজের স্তূপ। ঘরের মাঝখানে সবচেয়ে আলোকিত জায়গাটায় ছিল একখানা ছোট্ট সাদাসিধে ডেস্ক (তিন ফুট বাই দুই ফুট আয়তনের) আর একখানা কাঠের আর্মচেয়ার। আর্মচেয়ারের পিছনের বইয়ের তাকগুলোর মাঝখানে, জানালার বিপরীত দিকে ছিল চামড়ায় মোড়া একটা সোফা। সময়ে সময়ে বিশ্রামের জন্যে এই সোফাটায় শুতেন মার্কস। চুল্লীর উপরকার তাকে থাকত আরও কিছু বই, চুরুট আর দেশলাই, তামাকের বাক্স, কাগজ চাপা আর কিছু ছবি মার্কসের স্ত্রী আর মেয়েদের, ভিল্‌হেল্‌ম ভল্‌ফ* আর ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের।

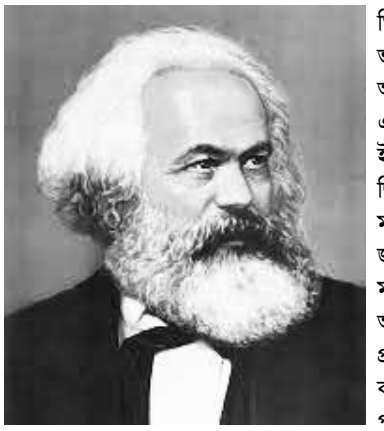

মার্কস ছিলেন কড়া ধূমপায়ী। কথায় কথায় একবার আমায় বলেছিলেন, 'পুঁজি' বইটা লেখার সময় যত চুরুট টেনেছি বইটা থেকে এমনকি তারও দাম উঠবে না'। তবে দেশলাইয়ের খরচ ছিল তাঁর অনেক বেশি। পাইপ বা চুরুট টানতে ঘনঘন ভুলে যেতেন, আর সেগুলো জ্বালাতে অল্প সময়ের মধ্যে এমন বাক্সের পর বাক্স দেশলাই খালি করে ফেলতেন যে তার সংখ্যা দেখলে অবিশ্বাস্য ঠেকত। বই কিংবা কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে – কিংবা বলা চলে অগোছালো করতে কাউকেই দিতেন না তিনি। বইপত্রের অগোছালো ভাবটা ছিল আপাত বিশৃঙ্খলা, আসলে সবকিছুই থাকত তাদের নির্দিষ্ট জায়গায়, ফলে দরকার পড়লেই নির্দিষ্ট বই কিংবা নোটবইটি হাতের কাছে পেয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হতো। এমনকি আলাপের সময়ও প্রায়ই তাক থেকে বই টেনে নিতেন, আর ঠিক তখন যে-বিষয়ের উল্লেখ করছিলেন বই থেকে তার সপক্ষে উদ্ধৃতি কিংবা পরিসংখ্যানের নজির দেখাতেন। তিনি ও তাঁর পড়ার ঘর ছিল একাত্ম, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতখানি তাঁর আয়ত্তে ছিল ঠিক ততখানিই আয়ত্তে ছিল ওই পড়ার ঘরের বই আর কাগজপত্রগুলি।

বই সাজানোর ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক সামঞ্জস্য রক্ষা নিয়ে মাথা ব্যথা ছিল না মার্কসের। তাঁর বইয়ের তাকে নানা আকার-আয়তনের বই আর পুস্তিকা পাশাপাশি রাখা থাকত। বইপত্র সাজিয়ে রাখতেন তিনি বিষয়বস্তু অনুসারে, আকার অনুযায়ী নয়। বই ছিল তাঁর কাছে মনের হাতিয়ার, বিলাসদ্রব্য নয়। মার্কস বলতেন, 'ওরা আমার দাস, যেমনটি চাইব সেইভাবে আমার কাজে লাগতে হবে ওদের'। বইয়ের আকার বা বাঁধাই, কাগজ বা টাইপের গুণাগুণ – এসবের ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাঁর। অবলীলায় তিনি পাতার কোণ মুড়ে রাখতেন, মার্জিনে পেন্সিল দিয়ে চিহ্ন দিতেন, লাইনকে লাইন দাগ দিয়ে রাখতেন। বইয়ের মার্জিনে লেখা অভ্যাস ছিল না তাঁর, তবে বইয়ের লেখক মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন মনে হলে কখনও এক-আধটা বিস্ময়সূচক কিংবা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেওয়া থেকে আত্মসংবরণ করতে পারতেন না। লেখার নিচে দাগ দেওয়ার তাঁর যে–পদ্ধতি ছিল তাতে যেকোনো বই থেকে প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ খুঁজে পাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হতো। বহুদিন পরে পরে নোট বইগুলো আর বইয়ের নিম্নরেখ অনুচ্ছেদগুলো আবার পড়ার একটা অভ্যাস ছিল তাঁর, স্মৃতিতে সেগুলো জিইয়ে রাখার জন্যে এর প্রয়োজন হতো। মার্কসের ছিল অসামান্য নির্ভরযোগ্য স্মৃতিশক্তি। হেগেলের উপদেশ অনুযায়ী অপরিচিত বিদেশি ভাষায় লেখা কবিতা তরুণ বয়স থেকে কণ্ঠস্থ করে এই শক্তিকে বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

হাইনে আর গ্যায়টের কাব্য ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ, কথাবার্তায় হামেশাই তাঁদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। সকল ইউরোপীয় ভাষার কবিদের তিনি ছিলেন অধ্যবসায়ী পাঠক। প্রতি বছর একবার করে মূল গ্রীক ভাষার ইস্কাইলস** পড়ার তাঁর অভ্যাস ছিল। তিনি মনে করতেন, মানবসমাজ যত নাট্যপ্রতিভার জন্ম দিয়েছে তাঁদের মধ্যে দুই মহত্তম স্রষ্টা হলেন ইস্কাইলস আর শেক্সপীয়র। শেক্সপীয়রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। কবির রচনাবলী একেবারে খুঁটিয়ে পড়েছিলেন তিনি, এমনকি সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটিও ছিল মার্কসের নখদর্পণে। এই মহান ইংরেজ নাট্যকারের প্রতি সমগ্র মার্কস পরিবারের ছিল সত্যিকার অচলা ভক্তি; শেক্সপীয়রের বহু রচনাই মার্কসের তিন মেয়ের কণ্ঠস্থ ছিল। আগেই ইংরেজি পড়তে পারতেন মার্কস, কিন্তু ১৮৪৮ সালের পর তিনি যখন ওই ভাষায় তাঁর দখল পাকাপোক্ত করতে মনস্ত করলেন তখন শেক্সপীয়রের নিজস্ব শব্দ ও বাক্যভঙ্গি খুঁজে বের করে তার একটা তালিকা পর্যন্ত তৈরি করে ফেলেছিলেন। তাঁর প্রিয় কবিদের তালিকায় দান্তে আর রবার্ট বার্নসও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; মেয়েরা যখন এই শেষোক্ত স্কটিশ কবির ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তি করতেন কিংবা তাঁর রচিত গাথাগুলি গাইতেন তখন পরমানন্দে তা উপভোগ করতেন মার্কস।

.... সময়ে-সময়ে সোফাটায় শুয়ে পড়ে উপন্যাস পড়তেন। কখনও-কখনও একই সঙ্গে কয়েকখানা উপন্যাসও পড়তেন তিনি, ঘুরে ঘুরে একেকবার একেকটা বই একটু-একটু করে। ডারউইনের মতো মার্কসও ছিলেন একেবারে উপন্যাসের পোকা; তাঁর পছন্দ ছিল আঠারো শতকের উপন্যাস, বিশেষ করে ফিলডিঙের 'টম জোন্স' বইটি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তাঁর কাছে সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক ঠেকত পোল দ্য কক, চার্লস লেভার, বয়োজ্যেষ্ঠ আলেকসান্দর দ্যুমা ও ওয়াল্টার স্কটের রচনাবলী; 'স্কটের ওলড মর্টালিটি' বইটিকে তো সেরা শিল্পকর্ম বলেই গণ্য করতেন। অ্যাডভেঞ্চার আর হাসির গল্পের দিকে স্পষ্টতই পক্ষপাতিত্ব ছিল তাঁর।...বালজাকের তিনি এত ভক্ত ছিলেন যে ভেবেছিলেন রাজনীতি-সংক্রান্ত অর্থশাস্ত্র বিষয়ে বই লেখা শেষ করেই বালজাকের মহৎ রচনাবলী 'La Comedie Humaine' নামের একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখে ফেলবেন। বালজাককে শুধু যে তাঁর যুগের ইতিহাসবেত্তা জ্ঞান করতেন মার্কস তাই নয়, লুই ফিলিপের রাজত্বকালে যে-সব চরিত্র ছিল ভ্রূণাকারে এবং লেখকের প্রয়াণের পর তৃতীয় নেপোলিয়ানের আমলে একমাত্র যেগুলি পূর্ণপরিণত হয়ে উঠেছিল সেইসব সম্ভাব্য চরিত্রের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিমান স্রষ্টা বলেও তাঁকে মনে করতেন।

...নানা ভাষা আয়ত্ত করার প্রতিভা ছিল তাঁর অসামান্য। তাঁর মেয়েরাও উত্তরাধিকারসূত্রে বাবার এই গুণটি পেয়েছিলেন। রুশ ভাষা শিখতে শুরু করেন তিনি যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ অতিক্রান্ত করে গেছে। যদিও ওই ভাষার সঙ্গে মার্কসের জানা আধুনিক বা প্রাচীন কোনও ভাষারই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ছিল না, তবু মাত্র মাস ছয়েকের মধ্যে ভাষাটি তিনি এতদূর ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে রুশ কবি ও গদ্যলেখকদের রচনা পড়ে তা থেকে আনন্দ পাওয়ার অবস্থায় পৌঁছে ছিলেন। রুশ কবি ও লেখকদের মধ্যে তাঁর পছন্দ ছিল পুশ্‌কিন, গোগোল ও শ্চেদ্রিনের রচনা। সরকারি তদন্তের যে রিপোর্টগুলি রাজনৈতিক সত্য উদ্ঘাটনের কারণে তৎকালীন রুশ গভর্নমেন্ট প্রকাশ না করে চেপে দিয়েছিল সেগুলি যাতে পড়তে পারেন এই উদ্দেশ্যেই রুশ ভাষা শিখেছিলেন তিনি। গুণগ্রাহী বন্ধুরা ওই সব দলিল মার্কসের জন্যে সংগ্রহ করেছিলেন; ফলে সারা পশ্চিম ইউরোপে তিনিই ছিলেন নিশ্চিন্তভাবে একমাত্র রাজনীতি-সংক্রান্ত অর্থশাস্ত্রবিদ, ওই দলিলগুলি সম্পর্কে যাঁর জ্ঞানগম্যি ছিল।

কবি ও ঔপন্যাসিকদের রচনাপাঠ ছাড়াও মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেওয়ার অপর একটি আশ্চর্য উপায় আবিষ্কার করেছিলেন মার্কস, তা হলো অঙ্ক কষা। গণিতের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ ধরনের ঝোঁক ছিল। বীজগণিত এমনকি তাঁকে মানসিক সান্ত্বনা পর্যন্ত যোগাত, ঘটনাবহুল জীবনে সবচেয়ে মনোকষ্টের মুহূর্তগুলিতে তিনি শরণ নিতেন এই অঙ্কশাস্ত্রটির। স্ত্রীর শেষ অসুখের দিনগুলিতে স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক কাজে মন দিতে পারতেন না তখন স্ত্রীর রোগযন্ত্রণার দরুন যে-মনোকষ্ট ভোগ করতেন তা ভুলে থাকতেন একমাত্র অঙ্ক কষায় ডুবে থেকে। মানসিক কষ্টভোগের ওই সময়টায় লিখে ফেলেছিলেন অণুকলন (infinitesimal calculas) বিষয়ক উচ্চতর গণিতের একখানা বই। বিশেষজ্ঞদের মতে বইখানির বৈজ্ঞানিক মূল্য অপরিসীম। উচ্চতর গণিতের মধ্যে মার্কস প্রত্যক্ষ করেছিলেন দ্বান্দ্বিক গতির সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য এবং ওই একই সঙ্গে সরলতম নমুনা। তিনি এই মত পোষণ করতেন যেকোনো বিজ্ঞানকে সত্যিকার পরিণত বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া চলে না যতক্ষণ না তা গণিতের ব্যবহারে অভ্যস্ত হচ্ছে।

যদিও মার্কসের নিজস্ব গ্রন্থাগারে তাঁর সারা জীবনব্যাপী গবেষণাকার্যের সঙ্গে সঙ্গে সযত্নে সংগৃহীত হাজার খানেকেরও বেশি বই ছিল, তবু তাঁর পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। বেশ কয়েক বছর ধরে তাই নিয়মিতভাবে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন তিনি। ওই গ্রন্থাগারে গ্রন্থতালিকার প্রশংসায় তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ।

যদিও অনেক রাত করে শুতে যেতেন মার্কস তবু সর্বদাই সকাল আটটা থেকে নটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে পড়তেন। তারপর খানিকটা কালো কফি খেয়ে নিয়ে খবরের কাগজগুলো দেখতেন। অতঃপর ঢুকতেন গিয়ে পড়ার ঘরে, রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত সেখানে কাজ করতেন তিনি। একমাত্র খাওয়ার সময়গুলোয় তিনি কাজ বন্ধ রাখতেন আর বন্ধ রাখতেন আবহাওয়া অনুকূল থাকলে সন্ধ্যের দিকে হ্যাম্পস্টেড হীথে *** এক চক্কর বেড়ানোর জন্যে। কখনও-কখনও দিনের বেলায় ঘন্টা খানেক কি ঘন্টা দুয়েক সেই সোফায় শুয়ে ঘুমিয়েও নিতেন। যৌবন-বয়সে প্রায়ই রাত জেগে কাজ করা তাঁর অভ্যাস ছিল।

** ভিল্‌হেল্‌ম ভল্‌ফ (১৮০৯-১৮৬৪) জার্মান প্রলেতারিয়ান বিপ্লবী এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী। এঁর নামেই 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি উৎসর্গ করেন মার্কস।*

*** ইস্কাইলস (খৃ. পূ. ৫২৫-৪৫৬ সাল) – বিশ্ববিশ্রুত প্রাচীন গ্রীক কবি ও নাট্যকার। ধ্রুপদী বিয়োগান্তক কাব্যনাটক রচয়িতা।*

**** লন্ডনের উপকণ্ঠে এক টিলাসঙ্কুল প্রান্তর।*

দমন-পীড়ন চালিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চায় সরকার

(১ম পৃষ্ঠার পর) তবিয়তে সংসদে আজও আসীন আছেন। এখানে আইনবিভাগ, বিচার বিভাগ কাজ করছে না। শুধু তাই নয়, বিএনপি নেত্রীর বিরুদ্ধে যেসময় এই মামলাটি হয়, সেই সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে, সেসময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছিল। যেমন – বেপজায় পরামর্শক নিয়োগে দুর্নীতি (২ কোটি ১০ লাখ ১ হাজার ৬৮৮ টাকা), ফ্রিগেট ক্রয় দুর্নীতি মামলা (৪৪৭ কোটি টাকা), মেঘনা ঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুর্নীতি মামলা (১৭ কোটি ৮৯ লাখ টাকা), খুলনায় ভাসমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলা (৩ কোটি টাকা), নাইকো দুর্নীতি মামলা (১৩ হাজার ৬৩০ কোটি ৫০ লাখ টাকা), ৮টি মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলা (৭০০ কোটি টাকা), বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার নির্মাণ দুর্নীতি মামলা (৫২ কোটি টাকা) ইত্যাদি। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় এসেই সেই মামলাগুলো প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু বিএনপি নেত্রীর নামে মামলা চালিয়ে এই নির্বাচনের বছরে তাকে জেলে ঢোকানো হয়েছে।

শুধু সরকার প্রধান বলে নয়, এই সময়ে সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন প্রায় সাত হাজারের বেশি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এসবের মধ্যে এমনকি খুনের মামলাও আছে। এসব তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহজেই বোঝা যায় আদালত পুরোপরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে। উচ্চ আদালতের কী হাল – তাও স্পষ্ট হয়েছে গত কয়েকদিন আগে একজন সাবেক প্রধান বিচারপতির সাথে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের আচরণ দেখে। সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাকে 'পাকিস্তান প্রেমী', 'দালাল', 'সংখ্যালঘু', 'মনিপুরী', 'প্রধানমন্ত্রীর আর্শীবাদে নিয়োগপ্রাপ্ত' ইত্যাদি বলার পাশাপাশি তুই তোকারী সম্বোধনও করা হয়েছে। পরিস্থিতি এমন হলো যে, তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন। ফলে বাংলাদেশে এখন এমন অবস্থা–ন্যায়বিচার, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা এসব কথায় এখন আর মানুষ বিশ্বাস করে না।

বিএনপি নেত্রী দুর্নীতি করতে পারেন না বা বিএনপি জনগণের পক্ষের রাজনীতি করে – উপরের আলোচনায় আমরা তা বলতে চাইনি। বিএনপি-জামাতেরও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও এক। তারাও তিনবার ক্ষমতায় এসেছে। সেসময় তাদের সৃষ্ট দুর্নীতি-লুটপাটের অসংখ্য নজির বাংলাদেশের মানুষ ভুলতে পারবে না। তখনও গণতন্ত্র, আইনের শাসন বলে কিছু ছিল না, বিএনপি'র সাথে সংশ্লিষ্ট নেতা-কর্মীরা সম্পদের পাহাড় জমিয়েছিল, বিদেশে সম্পদ পাচার করেছিল। এসবের যদি বিচার হতো তবে সেখানে আমাদের আপত্তি থাকার কথা ছিল না। কিন্তু তা কি করছে সরকার? আবার বিচার কি কেবল খালেদা জিয়া বা বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের কর্মকাণ্ডের হবে? গত ৮ বছর ধরে যে দুঃসহ পরিস্থিতি দেশে তৈরি করেছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার, যেভাবে ব্যাংক ডাকাতি, শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি, হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করার নজির স্থাপন করেছে – তার কি কোনো বিচার হবে না? সেটা হওয়া কি উচিত নয়? তা না হলে এই বিচারিক প্রক্রিয়ার সাথে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও জড়িয়ে আছে – তা বলা কি ভুল হবে?

দেশটাকে আওয়ামী লীগ সরকার কোথায় নিতে চাচ্ছে তা গত ৭ মার্চের সমাবেশের প্রস্তুতি দেখেও বোঝা গেছে। এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে পুরো ঢাকায় তারা অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছিল। পাবলিক পরিবহনগুলো সরকারি দলের জমায়েত আনার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় জোর করে জমায়েত বাড়ানোর জন্য নেতা-কর্মীদের অশ্লীল-অশ্রাব্য ব্যবহারের শিকার হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ, এমনকি পথচারীরাও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগের ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়েছিল। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জোর করে, হুমকি দিয়ে এমনকি গায়ে হাত তুলে ছেলে-মেয়েদের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নেয়া হয়েছে। এভাবে একদিকে তারা ভয়-ভীতি-লোভ দেখিয়ে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ করছে, অন্যদিকে বিরোধীদলগুলোর কণ্ঠ রোধ করছে, জনগণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জায়গাগুলোকে নস্যাৎ করতে তৎপরতা চালাচ্ছে। এসব করে তারা জনগণের মধ্যে এই বার্তা-ই দিতে চায় যে, 'আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোনো দল নেই। ক্ষমতায় তাদের ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।' এই সরকার গত ২০১৪ সালেও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় এসেছিল। এবারও তেমন পরিস্থিতি তারা তৈরি করতে চাইছে। ক্ষমতায় থেকেই সরকারি তহবিলের টাকা খরচ করে জেলায় জেলায় নির্বাচনী জনসভা করছে আওয়ামী লীগ ও তার জোটভুক্ত দলগুলো।

আজকে আওয়ামী লীগের জায়গায় বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে একই কাজ করত। আমরা তারও প্রতিবাদ করতাম। আজ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার তাদের বিরুদ্ধে ন্যূনতম প্রতিবাদ শুনতেও প্রস্তুত নয়। মানুষের প্রতিবাদের কণ্ঠকে কতভাবে স্তব্ধ করে দেয়া যায়, সেটাই তাদের ভাবনা। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের কুখ্যাত ৫৭ ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' করেছে। এ আইনের কারণে মুক্ত সাংবাদিকতা, নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ বলে আর কিছু করার আইনি সুযোগ থাকবে না দেশে। সরকারের বিপক্ষে যায় এমন যেকোনো তথ্য, সংবাদ, গবেষণা পত্রকে নিষিদ্ধ করা যাবে, লেখকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে। এভাবে সরকার নিজেদের প্রয়োজনে আইন করে, বিচার বিভাগকে কাজে লাগিয়ে ভিন্ন চিন্তাকে দমন করছে। সম্পূর্ণ একদলীয় ও অগণতান্ত্রিক শাসনের দিকে দেশকে নিয়ে যাচ্ছে।

এমন পরিবেশে মনুষ্যত্ব বাঁচে না, মানুষ হবার প্রক্রিয়াটিই ধ্বংস হয়ে যায়। এ ধরনের শ্বাসরোধ অবস্থায় কূপমণ্ডুক চিন্তার জন্ম হয়, বিস্তার ঘটে। তাই দেখছি আজ আমরা আমাদের চারপাশে। এদেশে আজ ধর্মীয় উগ্র ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর ব্যাপক আস্ফালনের কারণে কোনো মুক্তবুদ্ধি, প্রগতিশীল, গণতন্ত্রমনা মানুষই নিরাপদ নয়। কেবল চিন্তা প্রকাশের জন্য তাদের খুন হতে হচ্ছে, শারীরিক-মানসিক লাঞ্ছনার শিকার হতে হচ্ছে। নারীরা নিরাপদে নেই ন্যূনতম অর্থেও। ধর্ষণ-গণধর্ষণ-খুনের ঘটনা এখন নিত্যদিনের। পাহাড় থেকে সমতল, ক্যান্টনমেন্ট থেকে রাজপথ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কর্মস্থল – কোথাও তারা ভালো নেই। সংখ্যালঘু জনগণ নিরাপত্তাহীন। তরুণ-যুবকরা আশাহীন। সুযোগ আর সক্ষমতা থাকলে চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে।

এ-ই যখন দেশের অবস্থা, তখন সরকার টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় যাবার জন্য একদিকে বিএনপি-কে ঠেকাতে অন্যদিকে হেফাজতে ইসলামসহ বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দলগুলোর সাথে আঁতাতে ব্যস্ত। কেন? কারণ ক্ষমতায় যেতে হলে বিএনপিকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে হবে আর সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর ভোট লাগবে। আওয়ামী লীগের এই চরিত্র যখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার তখনও আমাদের দেশের কিছু বামপন্থী দল আওয়ামী লীগের প্রতি মোহগ্রস্ততা কাটাতে পারছে না। আওয়ামী লীগ আর বিএনপি'র মধ্যে মন্দের ভালো হিসাবে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকাটাই যৌক্তিক মনে করছে। তাদের বক্তব্য – বিএনপি-জামাত ক্ষমতায় এলে দেশ মৌলবাদী-জঙ্গীবাদী গোষ্ঠীর চারণক্ষেত্র হয়ে যাবে। ভাবটা এমন এখন যেন দেশ প্রগতিশীল আর গণতান্ত্রিক শক্তি চালাচ্ছে!

শত্রু-মিত্র নির্ধারণ করতে না পারা – এদেশের বাম আন্দোলনের একটা বড় ব্যর্থতা। আওয়ামী-বিএনপি'র চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যে এক তা আজও অনেক বামপন্থী দলের বোঝার ভ্রান্তি থেকে গেছে। তাই তারা আজও মনে করে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আওয়ামী লীগ সামান্য হলেও ধারণ করে কিংবা আওয়ামী লীগ যে উন্নয়ন ঘটিয়েছে তাতে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হলেও তেমন কোনো সমস্যা নেই। আসলে বামপন্থী দলগুলো মিলিতভাবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে যদি শ্রেণির রাজনীতিকে বিকশিত করতে পারত, তবে আজ আওয়ামী লীগের বিপরীতে বিএনপি, এই চিত্র দেশে থাকত না। দেশের সকল বুর্জোয়া শক্তি, লীগ-বিএনপিকে মিলিতভাবে বামপন্থীদেরই মোকাবেলা করতে হতো। কিন্তু সে পরিস্থিতি আজও তৈরি হয়নি। দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা আর গণআন্দোলন-শ্রেণি আন্দোলন গড়ে তোলার দুর্বলতা এর কারণ। আর নির্বাচন নিয়ে বামপন্থীদের ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাওয়ারও কিছু নেই। নির্বাচনে যদি তারা অংশগ্রহণ করে তবে নির্বাচনী ব্যবস্থার অসারতাকে প্রকাশ করাই হবে তাদের উদ্দেশ্য। নির্বাচন নিয়ে পড়ে থেকে বামপন্থীরা তাদের সংগঠন গড়ে তুলেছে, ইতিহাসে কখনই এটা ঘটেনি। বামপন্থীদের নিজস্ব লড়াকু শক্তি গড়ে তুলতে হবে গণআন্দোলনের মাধ্যমেই।

সরকার দেখাতে চায় তাদের বিরোধিতা করা মানে বিএনপি-জামাতকে সমর্থন দেয়া। কিছু বামপন্থী দলগুলোর মধ্যেও এমন মনোভাব আছে। তাই তারা সরকারের এত এত নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে পারে না। মনে করে, প্রতিবাদ করলে বিএনপি'র পক্ষ নেয়া হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আজ যদি আমরা বিরোধী শক্তির উপর সরকারের তীব্র দমন-পীড়নের প্রতিবাদ না করি, দু'দিন পর এই আক্রমণ আমাদের উপরও এসে পড়বে। এই অগণতান্ত্রিকতা সামাজিক ন্যায্যতা পাবে। দেশে ফ্যাসিবাদী শাসন আরও তীব্র রূপ লাভ করবে। তাই জনগণকে যুক্ত করে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অবশ্যই আমাদের সোচ্চার হতে হবে। পাশাপাশি বুর্জোয়া শক্তিগুলোর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যও জনগণের মধ্যে তুলে ধরতে হবে। তীব্র গণআন্দোলন-শ্রেণিআন্দোলন গড়ে তুলে দেখাতে হবে একমাত্র বামপন্থী-প্রগতিশীল শক্তিই এই সংকট থেকে সমাধানের পথ দেখাতে পারে।

১০ টাকা কেজি দরে ওএমএস এর চাল সরবরাহের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

১০ টাকা কেজি দরে ওএমএস এর চাল, প্রতি পরিবারে অন্তত একজন বেকারের চাকুরি, ৪ জনের পরিবারের জন্য মাসে ৮০০ টাকায় রেশন, বর্ধিত ভূমি উন্নয়ন কর প্রত্যাহারসহ ১৩ দফা দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের উদ্যোগে গত ১২ ফেব্রুয়ারি রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে ঘন্টাব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে বাসদ (মার্কসবাদী) গাইবান্ধা জেলা আহবায়ক কমরেড আহসানুল হাবীব সাঈদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড মানস নন্দী, রংপুর জেলা সমন্বয়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু, সুন্দরগঞ্জের তারাপুর ইউনিয়নের আবাদী জমি ও বাস্তভিটা রক্ষা সংগ্রাম কমিটির উপদেষ্টা বীরেন শীল।

জাফর ইকবালের উপর হামলাকারী সন্ত্রাসীর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে ও হামলাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার পক্ষ থেকে গত ৪ মার্চ বিকালে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ন্যায্য মজুরী ও সামাজিক মর্যাদাসহ বিভিন্ন দাবিতে গৃহশ্রমিক ফেডারেশনের মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গৃহশ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী, সামাজিক নিরাপত্তা, নিয়োগপত্র, সাপ্তাহিক ছুটিসহ বিভিন্ন দাবিতে গৃহশ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মহান স্ট্যালিন-এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ৫ মার্চ মহান স্ট্যালিন এর ৬৫তম প্রয়াণ দিবসে বাসদ (মার্কসবাদী) এর পক্ষ থেকে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন

''এই সত্য জেনে রাখা দরকার যে, পার্টি ও রাষ্ট্রের যে বিভাগে যাঁরা কাজ করুন না কেন, কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনার মান এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপলব্ধি যত ভালো, যত উন্নত হবে, তাঁদের কাজও তত সুন্দর তত, ফলপ্রদ হতে বাধ্য। বিপরীতে, কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনার মান যত নিচু হবে, মার্কসবাদের উপলব্ধি যত কম হবে, কাজের ক্ষেত্রে ক্ষতি ও ব্যর্থতার সম্ভাবনাও ততই বাড়বে, ততই কর্মীদের চিন্তা ও চরিত্রের গভীরতা নষ্ট হবে, তারা নিছক হুকুম তামিল করার যন্ত্রে পরিণত হবে, এক কথায় তাদের সামগ্রিক অধঃপতনের সম্ভাবনাও ততই বাড়বে।''

[বলশেভিক পার্টির উনবিংশ কংগ্রেসের রিপোর্ট থেকে (১৯৫২)]

হরিজন পল্লী উচ্ছেদের প্রতিবাদ

রংপুর সদর হাসপাতাল ও শ্যামাসুন্দরী খাল সংলগ্ন জমিতে প্রায় ২০০ বছর ধরে হরিজনরা বসবাস করে। তারা সকলেই পেশায় পরিচ্ছন্নতা কর্মী। অবমাননা, বঞ্চনা তাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। বসবাসের নিজস্ব কোনো জমি নেই। এখন সরকার শিশু হাসপাতালের নামে এই পল্লী উচ্ছেদের পরিকল্পনা করছে। পুনর্বাসনের কোনো উদ্যোগ না নিয়ে এই মানুষগুলোকে উচ্ছেদ করলে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে পথে বসা ছাড়া উপায় থাকবে না। এর প্রতিবাদে গত ১২ মার্চ 'রংপুর সদর হাসপাতাল হরিজন কলোনীবাসী'র পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়।

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই

সিরিয়ায় সংগঠিত যুদ্ধে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে শহীদ রুমী স্মৃতি পাঠাগার ও শিশু কিশোর মেলার উদ্যোগে গত ৪ মার্চ যুদ্ধবিরোধী র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

আলো হাতে চলা আঁধারের এক যাত্রী

(শেষ পৃষ্ঠার পর) দিতে হয়েছিল। কত নির্মম ছিল সেই অবস্থা তা আজ বলে শেষ করা যাবে না। আমাদের এ রচনার উদ্দেশ্যও তা নয়। বরং এমন তীব্র প্রতিকূলতার মধ্যেও আরজ আলী মাতুব্বর কোন শক্তির বলে জ্ঞানের শিখরে উঠলেন এবং দার্শনিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তা-ই আমরা দেখব।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পড়াশুনা অগ্রসর না হলেও যুবক বয়স থেকে আরজ আলী মাতুব্বর বরিশাল জেলার পাবলিক লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন লাইব্রেরিতে জ্ঞানসাধনা চালিয়ে যান। পড়াশুনার পাশাপাশি তাঁর ছিল সমাজের চারপাশটাকে দেখার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী চোখ। এই আগ্রহ তাঁর এমনি এমনি তৈরি হয়নি। সে সময়ের সামাজিক কর্তৃত্ব, নানা কুসংস্কার, অযৌক্তিক সামাজিক রীতি-নীতিকে অস্বীকার করার অব্যাহত লড়াই থেকে তাঁর এটি তৈরি হয়েছিল। আরজ আলী মাতুব্বর সমাজের মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়ে বুঝেছিলেন ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা কীভাবে সমাজের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে আর সেগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করছে সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা। তাই তিনি যেসব প্রশ্ন তুলেছিলেন সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন মনে হলেও আসলে সেগুলো ছিল সমাজের আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে।

তাঁর চিন্তার বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল প্রাণপ্রিয় মায়ের মৃত্যুকালের একটি ঘটনায়। আরজ আলী ধার্মিক মায়ের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য একটি ছবি তুলে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই কাজটি করতে গিয়ে সমাজের কাছে অমানবিক আচরণের শিকার হলেন। তাঁর মায়ের জানাজায় গ্রামের কেউ অংশ নিল না, 'ছবি তোলা ধর্মবিরোধী কাজ' আখ্যা দিয়ে। তিনি বলেছিলেন, 'দোষ যদি কিছু হয় সেটি তার, মৃত মানুষের তো কোনো দায় এতে নেই।' কিন্তু সেদিন সমাজের কর্তারা তাঁর কথা শোনেনি। মায়ের এই অবমাননা তাঁকে ভীষণভাবে আহত করেছিল। এই ঘটনা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল যুক্তিবাদী হতে, ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে।

কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মানুষের চেতনায় আঘাত করে মুক্তচিন্তার উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টাই ছিল তাঁর সংকল্প। তাঁর রচিত এক একটি বাক্য ছিল সমাজের অচলায়তনে এক একটি আঘাত। বলেছেন, যার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ নেই তার অস্তিত্ব স্বীকার করার কোনো যুক্তি নেই। তাঁর মতে যেসব ঘটনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো প্রমাণ নেই অথবা কার্যকারণ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়াস নেই, এক কথায় যুক্তি যেখানে অনুপস্থিত এই রকম কাহিনীতে বিশ্বাস রাখার নামই হলো অন্ধবিশ্বাস। বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। কতটা বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন তা বোঝা যায় এই কথায় – "বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত তাই কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আমাদের সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান যাহা বলে, তাহা আমরা অকুণ্ঠ চিত্তে বিশ্বাস করি। কিন্তু অধিকাংশ ধর্ম এবং ধর্মের অধিকাংশ তথ্য অন্ধ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

আরজ আলী মাতুব্বর চেয়েছিলেন সমাজের সমস্ত স্তরে প্রশ্ন করার অভ্যাস গড়ে উঠুক। যেকোনো কিছুকে বিনা বাক্যে মেনে নেয়াকে একদমই পছন্দ করতেন না তিনি। মনে করতেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্মই হয়েছে এই প্রশ্ন করার মানসিকতা থেকে। বলেছেন, "বাক্যস্ফূরণ আরম্ভ হইলেই শিশু প্রশ্ন করিতে থাকে, এটা কি? ওটা কি? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে, কলেজে ও কাজে-কর্মে অনুরূপ প্রশ্ন চলিতে থাকে, এটা কি, ওটা কি, এরূপ কেন হইল, ওরূপ কেন হইল না ইত্যাদি। এই রকম 'কি' ও 'কেন'র অনুসন্ধান করিতেই মানুষ আজ গড়িয়া তুলিয়াছে বিজ্ঞানের অটল সৌধ।"

বিশ্বখ্যাত দার্শনিক ভলতেয়ার যেমন বলেছিলেন, 'what is reasonable that is acceptable, that is truth`; আরজ আলী মাতুব্বরও মনে করতেন 'যুক্তিই সত্য'। মানুষের সক্ষমতার উপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। মনে করতেন মানুষকে কোনো নিয়ম দিয়ে আটকে রাখা যায় না। সে তার নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করে নিতে পারে। মানুষ কোনো জড় পদার্থ নয়, সজীব ও সচেতন অস্তিত্বশীল জীব হিসাবেই সে শির উন্নত করে দাঁড়াবে। তাই সমাজ প্রভুরা যখন কোনো কিছু না হবার পিছনে কপালের দোষ দেয় কিংবা ভাগ্যে ছিল না বলে তখন আরজ আলী ব্যঙ্গ করে বলেন, "হিন্দুধর্মে দেবদেবী সম্পদ বিতরণের মালিক হওয়ার কারণে কেষ্টসাধু (আরজ আলীর প্রতিবেশি) পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত কলা গাছকে লক্ষ্মী সাজিয়ে পূজা করে ধনী হতে পারেনি। অথচ আমেরিকার ফোর্ড সাহেব (হেনরি ফোর্ড) লক্ষ্মী পূজা না করেও সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি ছিলেন।" সমাজের এত অভাব-দুর্দশা যে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হয় না তা তিনি বলেছেন এভাবে – "বর্তমানে খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু ইহা খাদ্য-খাদকের সমতার অভাবেই ঘটিয়াছে, 'বে-ঈমান' বা অবিশ্বাসের জন্য নয়।"

ধর্মীয় নানান অপব্যাখ্যা যেগুলো মানুষকে ন্যায়নিষ্ঠা সম্পর্কে ভুল ধারণা দেয় সেগুলোকে অনুপম ব্যাখ্যায় তিনি খণ্ডন করেছিলেন। প্রত্যেকটি ধর্ম যে বিভিন্ন সময়ের সমাজ বাস্তবতার নিরিখে এসেছিল তা তিনি বুঝেছিলেন। তাই নানা কল্পকাহিনীর বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা তিনি দিতে পেরেছেন। বলেছেন, '... কুশ-লবকে গ্রহণ করলেও সীতাকে গ্রহণ করেননি রামচন্দ্র সেদিনও। ....তাই তিনি (সীতা) ক্ষোভে দুঃখে হয়তো আত্মহত্যা করেছিলেন। নারী হত্যার অপবাদ লুকানোর উদ্দেশ্যে এবং ঘটনাটি বাইরে প্রকাশ পাওয়ার ভয়ে শ্মশানে দাহ করা হয়নি। সীতার শবদেহটি, হয়তো লুকিয়ে প্রোথিত করা হয়েছিল মাটির গর্তে, পুরীর মধ্যেই। আর তা-ই প্রচারিত হয়েছে, 'স্বেচ্ছায় সীতা দেবীর ভূগর্ভে প্রবেশ বলে'।' ইসলাম ধর্মে 'হিল্লা প্রথা' নিয়ে বলেছেন, "তালাকের ঘটনা যে ভাবেই ঘটুক না কেন, ত্যাজ্য স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণে স্ত্রী যে নির্দোষ, ইহাই প্রমাণিত হয়। .....ইহাতে দেখা যায় যে, স্ত্রীর উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া অথবা ক্রোধাদির বশবর্তী হইয়া স্ত্রীত্যাগে স্বামীই অন্যায়কারী বা পাপী, অথচ পুনঃগ্রহণযোগ্য নির্দোষ স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণে 'হিল্লা' প্রথার নিয়মে স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্র করিতে হয় সেই নির্দোষ স্ত্রীকেই। অপরাধী স্বামীর অর্থদণ্ড বেত্রাঘাত ইত্যাদি না-ই হউক, অন্তত তওবা (পুনরায় পাপকর্ম না কবিবার শপথ) পাবারও বিধান নাই, আছে নিষ্পাপিনী স্ত্রীর ইজ্জতহানির ব্যবস্থা। একের পাপে অন্যকে প্রায়শ্চিত্র করিতে হয় কেন?"

সমাজের নিপীড়িত মানুষের কান্না তাঁকে প্রবলভাবে আলোড়িত করত। আকণ্ঠ দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েছেন বলে বুঝতেন তার কষ্ট। ধর্মীয় নৈতিকতাকে তিনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু দেখেছেন দুখী-দরিদ্র মানুষদের জন্য তথাকথিত ধর্মপ্রাণ মানুষদের অবহেলা। দেখেছেন ধর্ম পালনের নামে আনুষ্ঠানিকতার পেছনেই হাজার হাজার টাকা ব্যয়। তাই আক্ষেপ করে বলেছেন, "যে দেশে লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও শিশু অনাহারে অস্থি-কঙ্কালসার হয়ে সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে একমুঠো অন্ন পাচ্ছে না, সে দেশের বিমানবাহী হাজিদের নিজে উড়ে, টাকা উড়িয়ে হজ্বব্রত পালনের কোনো সার্থকতা নাই। যে দেশের হাজার হাজার গৃহহীন মানুষ মুক্তাকাশের তলে পথে-প্রান্তরে রাত কাটাচ্ছে, সে দেশে উপাসনা মন্দিরে সাততলা মিনার তৈয়ারে কোনো সার্থকতা নাই।" এমন সত্যউচ্চারণ আজ কতজন করতে পারে?

নারীদের ব্যাপারে তাঁর ছিল অসামান্য সংবেদনশীলতা। তিনি স্ত্রী-পুরুষের ভূমিকাকে কখনও পৃথক করে দেখেননি এবং সেভাবে শ্রম বিভাজনের নীতি গ্রহণ করেননি। এ ব্যাপারে কতটা ইতিহাসমনস্ক ছিলেন বোঝা যায়, "আদিম কালের মেয়েদের হাতেই প্রবর্তন হইল গম ও বার্লির চাষ অর্থাৎ কৃষিকাজের সূচনা। বস্তুত পৃথিবীতে কৃষিকাজের প্রবর্তন করিয়াছিল নারীরা, যীশুখ্রিষ্ট জন্মিবার প্রায় সাড়ে চারি হাজার বৎসর আগে।" সেই মেয়েদের এত অপমান, তাঁর মায়ের অপমান তাই তিনি সহ্য করতে পারেননি।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় আরজ আলী মাতুব্বর কতটা সমাজমনস্ক মানুষ ছিলেন। ধর্মের ব্যবহার নিয়ে নানা প্রশ্ন তুললেও তার প্রতিটি বিষয় ছিল আসলে সমাজের নানা অসঙ্গতিকে তুলে ধরার প্রয়াস। কিন্তু তাঁর এই কর্মকাণ্ড তৎকালীন সমাজপ্রভুরা মেনে নেয়নি। এখনও যেমন নেয় না। ধর্মীয় নানা কাহিনী ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর প্রশ্নগুলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর এ কর্মকাণ্ড সমাজের জন্য ক্ষতিকর হচ্ছে বলে তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট ও তাবলিগ জামাতের আমির করিম সাহেব আরজ আলীর সাথে দেখা করতে আসেন। ম্যাজিস্ট্রেট নানা জেরা করার পর আরজ আলী তাকে একটি প্রশ্নের তালিকা দেন। এ কথাও বলেন যদি এসব প্রশ্নের জবাব পান তবে জামাতের সদস্যও হবেন। কিন্তু আরজ আলী সেসব প্রশ্নের উত্তর পাননি। বরং তাঁকে 'কমিউনিস্ট' আখ্যা দিয়ে ফৌজদারি অপরাধে আসামী করা হয়। তিনি কিছুদিন জেলও খাটেন।

আরজ আলী মাতুব্বর কেবল প্রশ্ন ছুড়ে দেননি, খুঁজেছেন সমাধানও। চেয়েছিলেন সমতাভিত্তিক সাম্যের একটি সমাজ। একজন মানবতাবাদী দার্শনিক হয়েও তাঁর চিন্তার স্তর সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। মার্কসবাদী দার্শনিকের মতোই বলেছিলেন, "প্রত্যেকে নিজের 'সাধ্য' অনুযায়ী সমাজকে দেবে এবং নিজের 'প্রয়োজন' অনুসারে নেবে। এ সমাজে কারো কাজের অনিশ্চয়তা থাকবে না, ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ থাকবে না। মেহনতি মানুষের শোষণ করার মতো মালিক বা মুনাফা শিকারির দল থাকবে না, থাকবে না শ্রেণিগত বৈষম্যের বিশাল প্রাচীর।" জ্ঞানার্জনের আধুনিক কোনো সুযোগ-সুবিধা না পেলেও, উন্নত পারিপার্শিক সংশ্রব না থাকলেও কেবল প্রশ্নের অনুসন্ধানের জোরে আর নিপীড়িত মানুষের প্রতি প্রবল ভালোবাসা থেকে আরজ আলী মাতুব্বর কতটা উন্নত চিন্তা ধারণ করতে পেরেছিলেন, তা আজ ভাবলে অবাক হতে হয়।

শুধু নিজে জ্ঞানচর্চা করেননি, যে লাইব্রেরি ব্যবহার করে তিনি এতবড় সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন তা নিজের গ্রামেও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বিনা বেতনে ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সাফল্যের সাথে শিক্ষকতা করেছিলেন। ১৯২৫ সালে লামচরি গ্রামে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ জীবনে প্রতিষ্ঠা করেন 'আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরি'। সারা জীবনের অর্জিত সম্পত্তির বেশিরভাগ দান করেছেন এই পাবলিক লাইব্রেরির জন্য। ১৯৮৫ সালের ১৫ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দেশের এত বড় একজন জ্ঞানসাধক, দার্শনিক সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না। জানি না কারণ শাসকরা এই মানুষটির চিন্তা-জীবন সংগ্রাম আমাদের সামনে আনতে চায় না। কেননা যে নিপীড়িত মানুষের পক্ষে আরজ আলী মাতুব্বর দাঁড়িয়েছিলেন, সেই মানুষগুলোর অবস্থা আজও পাল্টেনি। যে যুক্তির শক্তি দিয়ে তিনি ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা, অন্ধবিশ্বাসের বেড়াজাল ভেদ করেছিলেন; আজও সেগুলো শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রবলভাবে সমাজে বহমান। এ কারণেই আরজ আলী মাতুব্বরের শিক্ষা, তাঁর দার্শনিক চিন্তাকে শাসকরা ভুলিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আমরা যারা অন্ধকারের বিরুদ্ধে সত্যের মশাল জ্বালব বলে লড়ছি তারা কী করব? প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সমাজচিন্তক আহম্মদ শরীফ বলেছিলেন, "চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কুসংস্কারের, অশিক্ষার, কুশিক্ষা ও অবৈজ্ঞনিকতার। তারই মধ্যে হাতে একটি আলো নিয়ে ঘুরেছেন এই বৃদ্ধ একাকী।" আরজ আলী যদি জীবনভর সত্যের আলো জ্বালিয়ে রাখার নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করে যেতে পারেন, আমরা কেন পারব না?

স্বাধীনতার ৪৭ বছর : গণতন্ত্র কতদূর?

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রতিযোগিতার শক্তি বাড়ানোর জন্যই পুঁজিবাদের স্বার্থেই এই জাতীয়করণ করা হয়েছিল। সেখানে উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল সর্বোচ্চ মুনাফা এবং উৎপাদন সম্পর্ক ছিল মালিক-শ্রমিকের। এই জাতীয়করণে রাষ্ট্রীয় পুঁজির একটা জাতীয় পোশাক পড়ানো থাকে, তা জনগণের মধ্যে আরও বেশি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং জাতীয় স্বার্থের কথা বলে জনগণকে আরও নির্মমভাবে শোষণ করে। কার্যত এটি ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকেই পাকাপোক্ত করে।

স্বাধীনতার পর একদিকে দেশ ইতোমধ্যে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণে বিপর্যস্ত, তার উপর যুদ্ধের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি। এরপর যখন দেশের সরকার বিশ্বপুঁজিবাদের চরম সংকটকালে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে দেশ পরিচালনা করে এবং পুঁজিপতি ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের দেশ পরিচালনায় প্রাধান্য দেয় – তখন দেশে এক চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। তার উপর কালোবাজারি, অসাধু ব্যবসায়ী, দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী-আমলা-আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের অবাধ প্রশ্রয় দেয়ার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। ভয়াবহ খাদ্যসংকট সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র বাজেট ঘাটতিতে পড়ে বেশি করে নোট ছাপাতে থাকে ও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। শুরু হয় মুদ্রাস্ফীতি। সাথে সাথে চলতে থাকে দেশি-বিদেশি লুটপাট, বিদেশে অর্থ পাচার, বৈদেশিক মুদ্রার কালোবাজার। মানুষের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। বিক্ষোভ বাড়তে থাকে এবং তখন একে দমনের জন্য রাষ্ট্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে ব্যাপক দমন শুরু করে, ন্যূনতম মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারেরও গলা টিপে ধরে। পুলিশ প্রশাসনের সাথে যুক্ত হয় রক্ষীবাহিনী। রক্ষীবাহিনী গ্রেফতারের পর বিচারের বিষয় ছিল না। হাজার হাজার মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা করে রক্ষীবাহিনী। ১৯৭৪ সালে দেশে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা জারি করা হয়। সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে দিয়ে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। সরকারি পত্রিকা ব্যতীত আর সকল পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। এইভাবে দেশ এক চূড়ান্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে চরম দেউলিয়াত্বের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

এই হলো দেশের শুরু। এরপর ক্যু, পাল্টা ক্যু, হত্যা, পাল্টা হত্যা – প্রথমে জিয়াউর রহমান ও তারপর এরশাদের স্বৈরাচারী সামরিক সরকার ক্ষমতায় এলো। এরশাদের স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন করে, অনেক প্রাণ দিয়ে নির্বাচনের দাবি আদায় করল মানুষ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাস্তবে ১৯৯১ সালেই একটা আপেক্ষিকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দিকে দেশ গেল। এর আগে ১৯৭৩ সালে একটি নির্বাচন হয়েছিল। সেটাও ব্যাপক কারচুপি আর দখলদারিত্বের মধ্য দিয়ে হয়েছিল। সামরিক সরকারগুলোর সময়ে যে নির্বাচনগুলো হয়েছিল সেগুলোকে তো কোনভাবেই ন্যূনতম গণতান্ত্রিক বলা যায় না। ফলে স্বাধীনতার ২০ বছর পরই বাস্তবে একটা নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন দেশে হলো। মানুষ মনে করেছিল এবার তাদের ভাগ্যের কিছুটা পরিবর্তন হবে, কারণ অন্তত আনুষ্ঠানিক অর্থে দেশে একটা সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। এতে হয়তো খানিকটা হলেও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত হবে। জনগণের প্রতিবাদ করার মৌলিক অধিকারগুলোকে খর্ব করা হবে না।

কিন্তু মানুষের সে আশা ভেঙে যেতে বেশি সময় লাগল না। ১৯৯১ থেকে শুরু করে বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগ পালা করে দেশ শাসন করেছে, মানুষ একদলের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে আরেক দলকে ভোট দিয়েছে, কিন্তু তাতে ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। দু'দলেরই নির্বাচনে একবার জিতলে ক্ষমতা না ছাড়ার মনোভাব বারে বারে সংকট নিয়ে এসেছে। ২০০৭ সালে জরুরি অবস্থা জারি করতে হয়েছে। দু'বছর জরুরি অবস্থা থাকার পর ২০০৯ -এ আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় যায়। ২০১৪ -তে একটি একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসেছে। এই অন্যায় শাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্য চূড়ান্ত ফ্যাসিস্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এটাকে এখন আর ভেঙে বলার প্রয়োজন রাখে না। এসব ইতিহাস সবাই জানেন। এই তো গণতন্ত্র! দেশ স্বাধীনতার ৪৬ বছর পার করেছে, কিন্তু বুর্জোয়া অর্থেও সহনশীল রাজনৈতিক পরিবেশ সে তৈরি করতে পারেনি। বুর্জোয়াদের গোষ্ঠীগত সংঘাত এখানে এত তীব্র যে, ৫ বছর পরপর লুটপাট কে করবে তা ঠিক করার জন্য বুর্জোয়া দেশগুলোতে যে নির্বাচন হয়, শান্তিপূর্ণ ভাগাভাগি হয়, সেই ন্যূনতম পরিবেশ তারা এখনও সৃষ্টি করতে পারেনি।

৪৬ বছরের এই পুঁজিবাদী শোষণে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ক্রমাগত বেড়েছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি এক ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। সংসদীয় গণতন্ত্রের চিহ্নটুকুও এখন আর নেই। ফলে দমন-পীড়ন-লুটপাটের মধ্য দিয়ে চরম ফ্যাসিবাদী শাসন সে কায়েম করে রেখেছে। বিরোধীদলগুলোকে রাজনৈতিকভাবে সর্বস্বান্ত করার এক মাস্টার প্ল্যান হাতে নিয়েছে সরকার। যেন আওয়ামী লীগ ছাড়া কারোরই দেশে থাকবার অধিকার নেই। প্রতিবাদ করলেই স্বাধীনতাবিরোধী তকমা লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে। সরকারের কিছু ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী এতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিছু টাকা, প্রতিষ্ঠা আর বড় বড় কিছু পদ পাওয়ার লোভে আওয়ামী লীগের নেতাদের পায়ের কাছে পড়ে থাকতে পারেন এমন লোকেরা ঠিক করে দিচ্ছেন কে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি, কে স্বাধীনতার বিপক্ষে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কীভাবে লেখা হবে তাও তারা ঠিক করে দিচ্ছেন। এর বাইরে কিছু লেখা যাবে না, লিখলে তা হবে আইনের বিরোধী। পাঠ্যপুস্তকের পিছনে লিখে দেওয়া হচ্ছে 'শিক্ষা দিয়ে গরবো দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ'। দেশ যেন সম্পূর্ণ আওয়ামী লীগের। এই হচ্ছে আজকে ৪৭ তম স্বাধীনতা দিবসে দেশের অবস্থা, এই হচ্ছে ৩০ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতার মূল্যায়ন। অথচ জয় বাংলা স্লোগান চলছে ঘরে বাইরে। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে নিজেদের মুখে ফেনা তুলছে আওয়ামী লীগ।

কাজেই স্বাধীনতার চেতনা বাস্তবায়ন করে একটি শোষণহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বামপন্থীদের নেতৃত্বে জনগণের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং বর্তমান আওয়ামী ফ্যাসীবাদকে তীব্র গণতান্ত্রিক গণআন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিহত করা।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ছিলেন। মায়ের আদর্শে প্রভাবিত হয়ে তিনি মার্কসবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হন। মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি শ্রমিক আন্দোলন ও নারী আন্দোলনকে বিচার করেছেন। ১৮৭৮ সাল থেকে জার্মানিতে তিনি নারীদের উপর শোষণ ও নিপীড়নের কারণ, তার তত্ত্বগত ভিত্তি নির্মাণ ও শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি আন্দোলন তথা নারী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, অগাস্ট বেবেল, মার্কসের কন্যা লারা লাফার্গ, কার্ল লিবনেখ, রোজা লুক্সেমবার্গসহ বহু বিশ্ব নেতৃত্বের সাথে তার গভীর হৃদ্যতা ছিল। মহামতি লেনিন ছিলেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বে ও পরে নারীদের প্রশ্নে নানা বিষয় নিয়ে লেনিনের সাথে তর্ক-বিতর্ক করেছেন। 'নারীদের প্রশ্নে লেনিন' বইটি ছিল ক্লারা জেটকিনের সাথে লেনিনের সাক্ষাৎকার, যা ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে আজও আমাদের পাঠ্য। ক্লারা জেটকিন ১৮৮৯ সালে প্যারিসে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলেসের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করে বক্তৃতা দেন। তাঁর এ বক্তব্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারীদের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

১৯০৮ সালের ৮ মার্চ আমেরিকার নিউইয়র্কে শ্রমঘন্টা কমানো, মজুরি বৃদ্ধি ও ভোটাধিকারের দাবিতে প্রায় ১৫,০০০ নারী ও অভিবাসী শ্রমিকদের অংশগ্রহণে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তাদের শ্লোগান ছিল 'Bread and Roses'। 'Bread' ছিল তাদের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার প্রতীক এবং `Roses' ছিল তাদের জীবনমান উন্নয়নের প্রতীক। এই সমাবেশ বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক নারী আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ওই দিবসের স্মরণে 'সোসালিস্ট পার্টি অব আমেরিকা' ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকাব্যাপী 'জাতীয় নারী দিবস' পালনের ঘোষণা দিয়েছিল। ওই বছরেই নভেম্বর মাসে ট্রায়াঙ্গেল শার্টওয়েস্ট কারখানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেছিল। ধর্মঘটরত শ্রমিকদের ৮০ শতাংশই ছিল নারী। তাদের এ ধর্মঘট ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলতে থাকে। ওই একই সালে 'মে দিবসে' ৬০ হাজার শ্রমিক এর প্রতিবাদে সমাবেশ করে। সমস্ত দিক থেকে এ আন্দোলনের প্রভাব ছিল বিশাল। একদিকে শ্রমিক আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, অন্যদিকে নারী-পুরুষের ভোটাধিকারের দাবিও জোরালো হয়ে উঠেছিল।

এই উত্তাল পরিস্থিতিতে ১৯১০ সালের আগস্ট মাসে কোপেনহেগেনে কমিউনিস্টদের 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। একই বছরে 'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারীদের দ্বিতীয় সম্মেলন'ও কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৭টি দেশের ১০০ জন নারী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে ক্লারা জেটকিন সম্পাদক হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হন। এই সম্মেলনে নিউইয়র্কের নারী শ্রমিকদের আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়ে ক্লারা জেটকিন প্রতিবছর 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মহামতি লেনিনের সমর্থনে অপরাপর সদস্যবৃন্দ সেই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। এ সম্মেলনে স্থির হয় মার্চ মাসের যেকোনো দিন এই দিবসটি পালন করা হবে। পরের বছর অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড এবং জার্মানিতে প্রথমবারের মতো নারী দিবস পালিত হয়। ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিবাদ হিসেবে পালিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯১০ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত মার্চের যেকোনো দিন বিভিন্ন দেশে নারী দিবস পালন করা হতো। কিন্তু, ১৯১৪ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে ৮ মার্চ নারী দিবস পালিত হচ্ছে।

এ বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ১০৮তম বার্ষিকী পালিত হচ্ছে। মানুষ হিসেবে একজন নারী সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফ্রান্সের প্যারি কমিউন, ফরাসি বিপ্লব, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক আন্দোলনসহ ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম , '৫২-র ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে নারীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে। কিন্তু, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য নারীসমাজ আজও অর্জন করতে পারেনি। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সর্বত্র নারীরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও মজুরি পুরুষের চেয়ে কম। বিশ্বব্যাংকের ২০১৭ সালের লেবার ফোর্স সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী, সারা পৃথিবীতে মাত্র ৩৯ শতাংশ নারী উৎপাদনমূলক বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করছে যেখানে বাংলাদেশে নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ২৯ শতাংশ। পৃথিবীতে নারী-পুরুষের সংখ্যানুপাত প্রায় সমান। অথচ, পৃথিবীর মোট সম্পদের একশ ভাগের মাত্র এক অংশের মালিক নারী। বাংলাদেশের সংবিধানে, আইনে ও সম্পদে নারীর সমঅধিকার নেই। পৃথিবীর সর্বত্র নারী যেমন সহিংসতার শিকার, বাংলাদেশেও নারী সহিংসতার শিকার। ২০১৫ সালের দি ওয়ার্ল্ড উইমেন-এর রিপোর্ট অনুসারে, পৃথিবীতে প্রতি তিনজন নারীর একজন কোনো না কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার, অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রায় ৮০ ভাগ নারী ঘরেই নিকটাত্মীয় দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়। ঘরে-বাইরে-কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই নারী নির্যাতিত, নিপীড়িত। নারীর ন্যায্য অধিকার আদায়ের প্রতীক হিসেবে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি বাংলাদেশে নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামেও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিশ্বজুড়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই এ দিবসকে উদ্‌যাপন করছে। কিন্তু যে সংগ্রামের ধারাবাহিকতা এই দিবস, তার যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সঠিক ধারার নারী আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আসুন, সেই সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় নারীমুক্তির আন্দোলনকে বেগবান করি।

ঘরের সব করেও যে পর!

(১ম পৃষ্ঠার পর) আসে। একটি পরিবারে গৃহ শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত হয়। বয়স কতো হবে? ১৪/১৫ বছর। এই বয়সে একটু সচ্ছল পরিবারের মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। পড়ালেখা করছে, ভবিষ্যৎ স্বপ্নের বীজ বুনছে। স্বপ্না সেই স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে রয়ে যায় ঢাকার চার দেয়াল ঘেরা একটি পরিবারে। প্রতিদিন সূর্য উঠার আগে তার ভোর হয়। সবাই ঘুম থেকে ওঠার আগেই তৈরি করতে হয় সকালের খাবার। তারপর ঘর ধোয়া-মোছা, কাপড় ধোয়া, দুপুরের খাবার তৈরি, গৃহকর্তার ছেলেটিকে স্কুল থেকে নিয়ে আসা, বিকালে আবার ঘর মোছা, রাতের খাবার তৈরি ইত্যাদি চলেই। সারাদিন এমনি কাজ করে করে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু চোখ দু'টো লেগে আসলেই গৃহকর্ত্রীর অশ্রাব্য গালাগাল। প্রায় মায়ের বয়সী–হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ে। সুদূর ভৈরবে এখন মধ্যরাত। এতক্ষণে একঘুম হয়ে গেছে। আর এখানে? এই মাঝ রাতেও ফুট-ফরমাস খাটতে খাটতে শরীর আর চলে না। কিন্তু ঘুমানো যাবে না। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তবেই তাকে ঘুমাতে হবে। ঘুমানোর আগ পর্যন্ত কখন কার কী প্রয়োজন হয়?

এরকম হাজারো স্বপ্নার প্রতিদিনের দিনলিপির চিত্র এটি। বাংলাদেশে কী পরিমাণ গৃহ শ্রমিক রয়েছে এর কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন শৈশব-বাংলাদেশ পরিচালিত এক সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী শুধু ঢাকা শহরেই ৩ লাখ শিশু গৃহ শ্রমিকের কাজের সাথে যুক্ত। যার শতকরা ৮০ ভাগ হচ্ছে মেয়ে শিশু, বাকী ২০ শতাংশ ছেলে শিশু। যাদের বয়স ৯ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। আবার ঢাকা শহরে গৃহ শ্রমিক হিসাবে কর্মরত নারী শ্রমিকের সংখ্যা ২ লাখ ২৫ হাজার। বর্তমানে এ সংখ্যা যে বহুগুণে বেড়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টে'র এক গবেষণায় দেখা যায়, একজন নারী প্রায় ১৬ ঘন্টা গৃহস্থালী কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এই শ্রমঘন্টা হিসাব করে একজন নারীর গৃহস্থালী কাজের মাসিক যে মূল্য পাওয়া গেছে তার পরিমাণ হচ্ছে ১০ হাজার ১৬৭ টাকা। যা বাৎসরিক হিসাবে প্রায় ১ লাখ ২১ হাজার ৯৯৬ টাকা। এভাবে হিসাব করলে দেশের ২৪.৫ মিলিয়ন (বিবিএস তথ্যানুসারে) পূর্ণ সময়ে গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত শহরের নারীরা বাৎসরিক ২৯ লাখ ৮৮ হাজার ৯১৪ মিলিয়ন টাকা বা ৪২.৭ বিলিয়ন ডলারের সমমূল্য কাজ করছেন। শহরে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন পূর্ণসময় কর্মজীবী নারী রয়েছেন। তাদের অর্ধেক সময় যদি গৃহস্থালী কাজে ধরা হয় তবে এর পরিমাণ দাঁড়াবে বাৎসরিক ১ লাখ ৫২ হাজার ৪৯৬ মিলিয়ন বা ২.১৮ বিলিয়ন ডলারের সম পরিমাণ। এ কাজের অর্ধেক যদি গৃহ শ্রমিকেরা করে থাকেন তাহলে জাতীয় অর্থনীতিতে গৃহ শ্রমিকের অবদান কয়েক মিলিয়ন ডলার তা বলাই বাহুল্য।

সাধারণত দুই ধরনের গৃহ শ্রমিক আছেন। স্থায়ী ও অস্থায়ী। অস্থায়ী গৃহ শ্রমিকেরা দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় এসে কাজ করে দিয়ে যান। আর স্থায়ী শ্রমিকেরা সব সময়ই কাজ করেন। এদের মাসিক বেতন ১০০০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত। এদের বিশ্রামের জন্য আলাদা কোনো ঘর নেই। পৃথক বাথরুম নেই। কোনো সাপ্তাহিক ছুটি নেই। এরা সবার পরে খায়। সবার পরে ঘুমায়। বিয়ে বা সন্তান ধারণ করলে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে বিদায় নিতে হয়। এতো পরিশ্রমের পরও পান থেকে চুন খসলেই বা কোনো কাজ পছন্দ না হলেই নেমে আসে বর্বরোচিত নির্যাতন। কিছুদিন আগেই আমরা পত্রিকায় দেখেছি, গৃহকর্মীকে গরম খুন্তি দিয়ে নির্যাতনের ঘটনা। এমন নির্যাতনের ঘটনা ক'টিই বা আর পত্রিকায় আসে। শারীরিক নির্যাতনের বাইরে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, মানসিক নির্যাতন তো আছেই। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্যমতে, ২০১৬ সালে এদেশে গৃহকর্মী হত্যা হয়েছে ২২ জন; যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ ও বিয়ের প্রলোভনে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে আত্মহত্যা করেছে ৫ জন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) এর অনুসন্ধান মতে, বিগত সাত বছরে গৃহকর্মীদের উপর শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে ৬৪০টি। এই অনুসন্ধানে আরও উঠে এসেছে বর্তমানে বাংলাদেশে এরকম গৃহকর্মীর সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। শুধুমাত্র ঢাকাতেই রয়েছে প্রায় দেড় লাখ গৃহকর্মী। অন্যদিকে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসেব মতে, গত দশ বছরে গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ৭০টি, নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেছে ৫৬৫ জন, অথচ মামলা হয়েছে মাত্র ৫০০টি। দিনে দিনে নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলছে।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই। এদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে মজুরি নির্ধারণের কোনো উদ্যোগ নেই। গৃহ শ্রমিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করলেও তা কাগজ কলমেই রয়ে গেছে। প্রাচীন যুগের ক্রীতদাসদের গল্প আমরা ইতিহাসের বইতে পড়ি। কিন্তু আমাদের ঘরে ঘরে আজ একুশ শতকের আধুনিক ক্রীতদাসদের কান্না দেয়ালের ফাঁক গলে কান পাতলেই শুনব।

সিরিয়ায় এখনও কেন যুদ্ধ চলছে?

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সর্ববৃহৎ কবরস্থান। লক্ষ লক্ষ লোক পালাচ্ছে দেশ ছেড়ে।

গোটা মধ্যপ্রাচ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের দখল নেয়ার জন্য সবগুলো রাষ্ট্রে আমেরিকার তাবেদার সরকার প্রয়োজন। যে-ই এখানে একটু স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে তাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে আমেরিকা। এতে তিনটি লাভ আমেরিকার– প্রথমত, প্রাকৃতিক সম্পদের নিরঙ্কুশ দখল নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, আমেরিকার অর্থনীতি চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত। অর্থনীতির সামরিকীকরণের মাধ্যমে সে এখন টিকে আছে। অস্ত্র উৎপাদন করে অর্থনীতি সচল রাখা হচ্ছে, সেই অস্ত্র কিনছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র যখন কিনে তখন তাকে ব্যবহারও করতে হয়। না হলে নতুন অস্ত্র কেনা যাবে না। সেজন্য বিভিন্ন জায়গায় আংশিক ও স্থানীয় যুদ্ধ লাগিয়ে রাখতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধে তাই জমজমাট অস্ত্র ব্যবসা, জমজমাট আমেরিকার অর্থনীতি। যেখানে সে নিজে যুদ্ধ করছে সেগুলোর কথা আমরা বাদই দিলাম, যেখানে সে পরোক্ষ ভূমিকায় সেখানেও তার ব্যবসা আছে। ইয়েমেনে সৌদি হামলার পরপরই আমেরিকার সাথে সৌদিআরবের ৮০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির চুক্তি হয়েছে। তৃতীয়ত, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামো নির্মাণের কাজ পায় মার্কিন প্রতিষ্ঠানসমূহ। এতেও আমেরিকান অর্থনীতি একটু চাঙ্গা হয়।

পূর্ব ঘৌতায় কী ঘটেছে?

এমন করেই চলছিল। আফগানিস্তানের পর ইরাক, ইরাকের পর লিবিয়া, কিন্তু লিবিয়ার পর সিরিয়ায় এসে আমেরিকা ধাক্কা খায়। সিরিয়ার ক্ষেত্রে আমেরিকা ইরাক-লিবিয়ার মতো একচেটিয়া দখল নিতে পারেনি। সিরিয়ার প্রতিরোধযুদ্ধে পরবর্তীতে রাশিয়া যুক্ত হয়েছে। রাশিয়ার যুক্ত হওয়ার একটা প্রেক্ষাপট আছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোতে ন্যাটোর ঘাঁটি স্থাপন করা, ইউক্রেনে মার্কিন-ইউরোপের তাবেদার সরকার বসানো– এ প্রক্রিয়ায় রাশিয়াকে সামরিকভাবে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা ইতোমধ্যে শুরু করে দিয়েছিল আমেরিকা ও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ। তার উপর সিরিয়ায় যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন রাশিয়ার আর অপেক্ষা করার অবস্থা রইল না। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে তারা সিরিয়াকে সাহায্য করতে চায় এই কথা বলে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। আকাশসীমায় রাশিয়ার আক্রমণ ও মাটিতে সিরিয়ান বাহিনীর আক্রমণে সিরিয়ার ৮৫ ভাগ এলাকা বিদ্রোহীদের দখলমুক্ত হলো। রাজধানী দামেস্কোর কাছে একমাত্র পূর্ব ঘৌতায়ই বিদ্রোহীদের অবস্থান ছিল গত ৬ বছর ধরে। সেটা দখলমুক্ত করা এবং সেখানে আটকে থাকা মানুষকে উদ্ধারের লক্ষ্যে গত ফেব্রুয়ারি মাসে আক্রমণ করা হয়। তাতে অনেকেরই দুঃখজনক মৃত্যু হচ্ছে। দুইপক্ষের গুলিবৃষ্টির মধ্যে পড়ে অনেক শিশু প্রাণ হারাচ্ছে। সেক্ষেত্রে দেখতে হবে, এর জন্য দায়ী কে? বিষয়টিকে সাধারণভাবে নেয়া মোটেই উচিত নয়। আক্রমণের ব্যাপারে প্রশ্ন নেই, প্রতিরোধ যুদ্ধে মানুষ মারা গেলেই মানবতার কথা উঠবে এবং এই প্রচারে সচেতন মানুষেরা ফেঁসে যাবেন এটা হতে পারে না। সিরিয়ার মানুষকে রক্ষা করার একমাত্র রাস্তা হলো একে দখলমুক্ত করে সিরিয়ার মানুষের হাতে ফিরিয়ে দেয়া। এর আগে আলেপ্পো মুক্ত করার সময়ও এই কথা উঠেছিল। আলেপ্পো মুক্ত হওয়ার পর সেখানে যারা বেঁচে আছে তারা আজ আপেক্ষিকভাবে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারছে। সেখান থেকে শরণার্থী হয়ে অন্য জায়গায় যাওয়ার হারও কমে এসেছে।

এ পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে। এর মানে হলো প্রায় পালাতে থাকা বিদ্রোহীদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ দেয়া, যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করা। সিরিয়ার সরকারি বাহিনী ও রাশিয়ান বাহিনী সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিনে ৫ ঘন্টা যুদ্ধবিরতি থাকবে আটকে পড়া মানুষকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য, বাকি সময় যুদ্ধ চলবে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ও প্রমাণিত যে, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে হত্যার যে ছবিগুলো আসছে তার বেশিরভাগই আগের ছবি। অর্থাৎ এই প্রচারের উদ্দেশ্যও বোঝা শক্ত নয়।

আসাদ বশ্যতা স্বীকার করেননি বলেই এই যুদ্ধ

রাশিয়াকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা ছিল আমেরিকার। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এবং ইরানের উপর আক্রমণের জন্য ২০০৯ সালে সিরিয়ায় সামরিক ঘাঁটি তৈরি করতে চেয়েছিল মার্কিন সরকার। কিন্তু আসাদ তাতে রাজী হননি। মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ইউরোপের স্থলপথের যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। ইউরোপ–মধ্যপ্রাচ্য স্থলপথ জলপথের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চেয়েছিল মার্কিন সরকার। সিরিয়া তাতে সম্মতি দেয়নি। পারস্য উপসাগরে সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার দুই তৃতীয়াংশের মালিকানা মার্কিন বশংবদ কাতার সরকারের – সেই গ্যাস কাতার - সৌদিআরব-জর্ডান-সিরিয়া-তুরস্ক হয়ে ইউরোপে পর্যন্ত পৌছানোর জন্য স্থলপথে গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিল মার্কিন সরকার। তাতে রাশিয়ার গ্যাসের উপর ইউরোপের যে নির্ভরশীলতা তাও কাটানো যেত, রাশিয়া গ্যাস বিক্রি বন্ধ করে দেবে বলে ইউরোপকে যে চাপ দেয় তা দিতে পারত না। কিন্তু আসাদ এর কোনোটিকেই বাস্তবায়ন করতে দেননি। ফলে আসাদ স্বৈরাচারী কিনা– এ ব্যাপারে তার দেশের মানুষ যাই মানে করুক, আমেরিকার কথা মতো সে চলেনি, তাই গণতন্ত্র ও মানবতার শত্রু হয়ে গেছে।

আমেরিকার বর্তমান পরিকল্পনা

মার্কিন বিদেশ সচিব রেক্স টিলারসন ১৭ জানুয়ারি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় সিরিয়া বিষয়ে বলেছেন, 'তাঁদের এখনকার উদ্দেশ্য প্রথমত, বাসার আল আসাদের সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য উত্তর সিরিয়ায় স্থায়ী মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা। দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসবাদীদের দখল করা এলাকাগুলিতে মার্কিন মদতপুষ্ট বাহিনীর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত, সিরিয়াকে ভাগ করে দখলকৃত মার্কিন এলাকায় আরও বেশি অস্থিরতা সৃষ্টি করা, যার সুযোগে সিরিয়াতে মার্কিন তাঁবেদার সরকার বসানো যায়।' (ইউএস পিস কাউন্সিল, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)

সিরিয়ার সংকট আমেরিকা ও তার সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর তাদের বাজার বিস্তারের পরিকল্পনার বাইরের কোনো ব্যাপার নয়। রাশিয়া নিজেও সাম্রাজ্যবাদী দেশ। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই করবার জন্য সিরিয়াতে সে অস্ত্র ধরেনি, সে ধরেছে তার নিজের স্বার্থে, কিন্তু তা আমেরিকার আক্রমণের বিরুদ্ধে সিরিয়ার সরকার কাজে লাগাতে পারছে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ আর নেই, যে একসময় ফ্যাসিবাদের নগ্ন আক্রমণ থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করেছিল, সাম্রাজ্যবাদীদের উপর জোর করে শান্তি আরোপ করেছিল। মার্কিন বর্বরতা দেখে একসময় তাদের দ্বারা গড়ে ওঠা তালেবান সরকারের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত রাহমাতুল্লাহ্ হাশমী বলেছিলেন, "মনে আছে গর্বাচেভ কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি করতে যাচ্ছেন। সবাই মনে করল তিনি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র উড়িয়ে দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি বললেন, আমি ওদের শত্রুকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছি। তারপর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে খণ্ড খণ্ড করলেন। তিনি সঠিকই বলেছিলেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে দেয়ার পর বহু লোকের চাকরি গেছে; পেন্টাগন থেকে, সিআইএ থেকে, এফবিআই থেকে। কারণ তখন তাদের আর প্রয়োজন নেই। তাই আমাদের মনে হয় যে, এই লোকগুলো এখন একটা জুজুবুড়ি খুঁজছে।"

এই জুজুবুড়ি হলো ইসলামী জঙ্গীবাদ। আমেরিকা ও তার দোসরদের উদ্যোগেই তার প্রসার ঘটছে। তাদের বিরুদ্ধেই আবার তারা যুদ্ধ করছে। প্রশ্ন উঠেছে, ১৫ বছর ধরে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ চলছে, কিন্তু তাতে সন্ত্রাসবাদ কমছে না, বরং বেড়েই চলছে। কেন? এর উত্তর হয়তো আর দেবার প্রয়োজন নেই।

আজ সিরিয়ার জনগণের প্রতি মমত্ব বা দায়বদ্ধতা প্রকাশের একটাই রাস্তা আছে, তা হলো দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা।

শৈশব-কৈশোর আজ অন্ধকারে

(১ম পৃষ্ঠার পর) করে নম্বর দিতে বলা হয়। শিক্ষক হিসেবে আত্মসম্মানে লাগে।' হাজার হাজার অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আজ এমন হতাশা আর গ্লানিতে গুমরে কাঁদছেন। সব কান্না চোখে দেখা যায় না। তাদের আর্তনাদ বলে দেয় সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কতটা উদ্বিগ্ন তারা।

পরীক্ষা মানেই এখন প্রশ্নপত্র ফাঁস। পরীক্ষা ব্যবস্থাটাই আজ পরিণত হয়েছে একটা প্রহসনে। প্রতিটি পরীক্ষাতে অসীম যন্ত্রণা নিয়ে লাখ লাখ শিক্ষার্থী পরীক্ষাকেন্দ্রে যাচ্ছে আর জানছে তাদের প্রশ্নপত্রটি আগেই ফাঁস হয়েছে এবং তা টাকা থাকলেই কিনে নেয়া যাচ্ছে। অবস্থা এখন এমন – ভালো প্রস্তুতি আর পরীক্ষায় ভালো করার উপায় নয়, পরীক্ষার আগে প্রশ্ন পাওয়া গেল কিনা এবং তার উত্তর যোগাড় করা গেল কিনা – তাই এখন ভালো ফলাফলের শর্ত। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হচ্ছে একেকটি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে। পরীক্ষার সংখ্যাও তাই বাড়ানো হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণি থেকেই সূচনা হয়েছে পাবলিক পরীক্ষার। প্রাণভরে শৈশবটুকু উপভোগ করার আগেই মুখোমুখি হতে হচ্ছে 'পিইসি' নামক পাবলিক পরীক্ষার। একদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁস অন্যদিকে পরীক্ষার সীমাহীন চাপ- শিশুরা কীভাবে সুস্থ মন নিয়ে বাঁচবে – তা এখন দুশ্চিন্তার ব্যাপার।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ও তার আগের সরকারগুলোর সময়ে শিক্ষাব্যবস্থায় অন্যতম বড় সংকট ছিল নকলের মহোৎসব এবং সময়মতো পাঠ্যবই ছাপাতে না পারা। ২০০১ সালে জোট সরকারের সময় নকলের মহোৎসব কিছুটা বন্ধ হলেও বই ছাপা নিয়ে সংকট ছিলই। ২০০৯ সালের পর প্রশ্নফাঁসের দৌরাত্ম্য তীব্র হতে থাকল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ২০১২ সালের পর থেকে অন্তত ৮০ বার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। প্রথম আলোর অনুসন্ধান অনুযায়ী, ২০১০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন পরীক্ষায় জালিয়াতি ও প্রশ্নফাঁস করতে গিয়ে ধরা পড়া ৭০টি ঘটনায় পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইনে মামলা হলেও কারও সাজা হয়নি। এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ হয়েছে। এবার অনেক কথার পর সরকার ঘোষণা করল – অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে পারলে ৫ লাখ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে, পরীক্ষা শুরুর সাতদিন আগে থেকে কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখা হবে। কিন্তু অসারের তর্জন গর্জন সার। দেখা গেল পুলিশ প্রশ্ন ফাঁসকারীদের ধরার পরিবর্তে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ধরেছে। কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য যারা করছে তারা আছে নাগালের বাইরেই।

'আমার ছেলেটাকে প্রতিদিন বিকেলে বলি, বাবা একটু বাইরে যা। খেলাধুলা কর। কিন্তু সন্তান যেতে চায় না। বলে, বাইরে খেলতে গেলে হোমওয়ার্ক করার সময় পাওয়া যাবে না।' – বলছিলেন মতিঝিল হাই স্কুলে পড়ুয়া এক সন্তানের মা। শিক্ষার যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে শৈশব, অভিভাবকদের এমন আক্ষেপ অমূলক নয়। তার শিশুটি খেলতে পারে না, প্রাণ খুলে হাসতে পারে না, এমনকি আকাশটা দেখার সময় পর্যন্ত পায় না! ভালো রেজাল্ট করার চিন্তা আর অসুস্থ প্রতিযোগিতা কেড়ে নিয়েছে শিশুমনের নির্মলতা। কিছু অভিভাবক দুঃখ করে বলেন, তাদের সন্তান মানুষের সাথে এমনকি পরিবারের সদস্যদের সাথেও মিশতে পারে না। ক্লাসে বন্ধুদের সাথে কথা বলতে পারে না। এ নিয়ে একটু গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যাবে, প্রবল মানসিক চাপ শিশুদের মননজগতকে বিকল বানিয়ে ফেলছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের দুটি পাবলিক পরীক্ষা চলে আসছিল যুগ যুগ ধরে। বর্তমান সরকারের সময়ে আরও নতুন দুটি পাবলিক পরীক্ষা 'পিইসি ও জেএসসি' চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। দেশের একজন শিক্ষাবিদও ওই দুটি পাবলিক পরীক্ষার পক্ষে মত দেননি। সরকারের একক সিদ্ধান্তে এগুলো চালু করা হয়েছে। পিইসি চালুর সাথে সাথে পাশের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০ শতাংশ। শিক্ষকদের বলা হয়েছে উদারভাবে নম্বর দিতে। সরকারের 'পাশের হারের' সুনাম কিনতে নিঃশেষ হয়েছে শিক্ষকের মর্যাদাবোধ।

পিইসি পরীক্ষা চালু হওয়ায় অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির বদলে আর্থিক অনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তা আর হয়রানি বেড়েছে কয়েকগুণ। তবে এখনও কোনো কোনো অভিভাবক, যদিও সংখ্যায় তারা খুব সামান্য, বিভ্রান্তি থেকে মনে করেন 'পিইসি পরীক্ষা থাকলে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার চাপ থাকবে। তখন তারা ভালোভাবে পড়বে।' এই চাপে রাখার কৌশল যে শিশুদের কতবড় ক্ষতি করছে তা উপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যাবার কথা।

মানুষের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় হলো তার শৈশব, যা এখন অন্ধকারে ঢেকে আছে। জ্ঞান, বিবেক, নৈতিকতার আলো আজ সেখানে পৌঁছায় না। শত শত অভিভাবকের আক্ষেপ, শিক্ষকের গ্লানি, ছাত্রের হতাশা এ দেশের শাসকরা অনুধাবন করে না। দায়িত্বহীনের মতো শিশুদেরকে চরম বিপদের দিকে ঠেলে দিতেও তাদের এতটুকু কুণ্ঠাবোধ হয় না। কিন্তু বিবেক ও মনুষ্যত্ব নিয়ে আমরা তো বাঁচতে চাই। তাই আমাদের দায় একটু বেশি। সারাদেশে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পিইসি বাতিলের দাবিতে কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। আমাদের সকলকে এ আন্দোলনে যুক্ত হওয়া ভীষণ প্রয়োজন।

জুম পাহাড়ের কান্না

(শেষ পৃষ্ঠার পর) নানা কূটচালে ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষ এখানে নিত্যদিনের ব্যাপার। তাই ভাবার সময় এসেছে – ভাইয়ে-ভাইয়ে এমন বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হলো কেন? সমাধানও বা কোন পথে আসবে?

পার্বত্য অঞ্চলের সামাজিক জীবন ভীষণ বৈষম্যমূলক। কোনো সরকারই এ অঞ্চলের মানুষের ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং উন্নত করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী (লুসাই, পাংখোয়া, খুমি, চাক) ইতোমধ্যে বিলুপ্তির পথে। এখানে পড়াশুনা-চিকিৎসাসহ জীবনযাপনের সুব্যবস্থা নেই। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরেও শিক্ষা-দীক্ষা-কর্মসংস্থান ইত্যাদিতে পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। আমরা জানি, একটা বৈষম্যমূলক সমাজে সংখ্যালঘু প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মানুষ সবচেয়ে বেশি নিপীড়নের শিকার হয়। তা-ই চলছে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে।

পার্বত্য অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর দৌরাত্ম্য, বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তির দাপট কিংবা ভাষা-সংস্কৃতির উপর আগ্রাসন আছে। এ কারণে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ, ভূমি উচ্ছেদ, নারী নিপীড়নসহ নানা ধরনের নির্যাতন, ভূমি অধিকার না পাওয়াসহ বিভিন্ন সংকট সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ে এই সংকটগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু তবুও আমাদের অনুধাবন করা দরকার এ সমস্ত সংকটের উৎসমুখ কোথায়। আজ দেশজুড়ে যে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা তা-ই পাহাড়ী-বাঙালিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বদলে সংঘাত সৃষ্টি করেছে, সেনাবাহিনীর শাসন পাকাপোক্ত করেছে, জনজীবনের সকল অধিকার থেকে ওই অঞ্চলের মানুষকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু মূল কারণের দিকে যেন আমাদের দৃষ্টি না যায় – সেজন্য বারে বারে শাসকরা পাহাড়ী-বাঙালি, পাহাড়ী-পাহাড়ী, মুসলমান-বৌদ্ধ এরকম নানা ধরনের বিভাজনের চেষ্টা করেছে। এখনও এই অপতৎপরতা চলছে।

রাঙামাটিতে দুই বোনের ধর্ষণের যে ঘটনা ঘটলো তার বিরুদ্ধে যদি পাহাড়ি-বাঙালি একসাথে প্রতিবাদ না করা যায়, যদি শিক্ষা-স্বাস্থ্য-নিরাপত্তাসহ সকল গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি নিয়ে মিলিতভাবে সোচ্চার না হওয়া যায় – তবে পাহাড়ে বসবাস করা মানুষগুলোর চোখের জল শুকাতে আরো বহু যুগ অপেক্ষা করতে হবে।

সিরিয়ায় এখনও কেন যুদ্ধ চলছে?

পশ্চিমা মিডিয়ায় এখন মানবতা নিয়ে তোলপাড়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব ঘৌতায় আক্রমণ করেছে সিরিয়ার সরকারি বাহিনী ও রাশিয়ান বাহিনী। তারা শত শত মানুষ মারছে, শিশুদেরও বাদ দেয়নি, ফলে তারা কতটা নৃশংস – এ সংবাদে সংবাদমাধ্যমগুলো মুখর। পূর্ব ঘৌতায় কিছু হয়নি, মানুষ মারা যাচ্ছে না, শিশুরা মরছে না এটা প্রমাণ করার জন্য এ লেখা নয়। কিন্তু আসলে মরছে কীভাবে, আর মারছেই বা কে? সিরিয়ায় এখন যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধ শুরু হলো কেন? এই যুদ্ধ থামছে না কেন? এ সকল প্রশ্নকে এই আলোচনার সাথে যুক্ত করা জরুরি।

যুদ্ধ কীভাবে শুরু হলো?

বিশ্বের বড় বড় মিডিয়াগুলোর দিকে চোখ দিন। গার্ডিয়ান থেকে শুরু করে আল জাজিরা পর্যন্ত সবার একই ভাষ্য – ২০১০ সালে তিউনিসিয়ায় যে 'আরব বসন্ত'র সূচনা, যা তিউনিসিয়ায় বেন আলী, মিশরে মোবারক সরকারের পতন ঘটিয়েছে, সেই বসন্ত মার্চে শুরু হয়েছে সিরিয়ায় আর জুলাইয়ে জন্ম দিয়েছে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী 'ফ্রি সিরিয়ান আর্মি'র। তারা ডিসেম্বরে শুরু করেছে সশস্ত্র লড়াই। তাদের লক্ষ্য হলো স্বৈরাচারী আসাদ সরকারের পতন। তারা সেই থেকে শুরু করে এখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে ইরাক ও সিরিয়ার একটা অংশ দখল করে থাকা জঙ্গী গোষ্ঠী 'আইএস'।

এ যুদ্ধ এতদিন চলত না। একে চালানো হচ্ছে। শুরু থেকে 'ফ্রি সিরিয়ান আর্মি' এবং তার সহযোগী 'আল নুসরা', 'জয়েশ আল ইসলাম', 'আহরার আল শাম', 'আল কায়েদা' ইত্যাদি জঙ্গীগোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র, অর্থ ও অন্যান্য কারিগরি সুবিধা দিয়ে আমেরিকাই দাঁড় করিয়েছে। আইএস এর সাথে আমেরিকার চলছে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। তাদের কাছে আমেরিকাই অস্ত্র বিক্রি করছে, ইসরায়েলের মাধ্যমে তেলের বিনিময়ে তার মূল্য পরিশোধ করছে আইএস। ইসরায়েল সরাসরি সিরিয়ার বিদ্রোহীদের সাথে যুক্ত। যুক্ত সৌদিআরব, কাতার, ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো।

এটা তো সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তাহলে তারা সবাই কেন যুক্ত হলেন? বিষয়টি বুঝতে হলে বড় ভাই হিসেবে আমেরিকার মহান দায়িত্বের কথাটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। এই প্রবল দায়িত্ববোধ থেকে তারা ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে ও দখল করে রেখেছে। লেবানন ও ফিলিস্তিনে তাদের ভূমিকায় চলছে ইসরায়েলি বর্বরতা, ইয়েমেনে সৌদী আরবের আক্রমণে তারা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করছে, সুদানকে দু'ভাগ করেছে। এখন সিরিয়াতে আমেরিকার তত্ত্বাবধানে চলছে নির্মম যুদ্ধ। আমেরিকার দায়িত্বটা কী? এসব জায়গায় সে কী করতে চায়? দুটো কাজ সে করতে চায়– 'গণতন্ত্র ও মানবতা ফিরিয়ে আনতে চায়।' এই গণতন্ত্র ও মানবতা ফিরিয়ে আনার কথা আমরা শুনেছি ইরাক ধ্বংস করে তাদের নেতা সাদ্দাম হোসেনকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসি দেবার সময়, শুনেছি লিবিয়ায় গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে গাদ্দাফিকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারার সময়। আফগানিস্তানে হঠাৎ এক রাতে ৭৫টি ক্রুজ মিসাইল নিয়ে হামলা করে জানালো তারা মানবতার শত্রুকে খুঁজছে। গণতন্ত্র ও মানবতার এই আমেরিকান উৎসবে মধ্যপ্রাচ্য আজ পৃথিবীর *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস
ইতিহাসের এক উজ্জ্বল দিন

১৮৫৭ সালে নিউইয়র্কের সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকদের আন্দোলন থেকে ঐতিহাসিক ৮ মার্চের উদ্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশে যেমন গার্মেন্টসে নারীরা শ্রম দেয় তেমনি নিউইয়র্কের বস্ত্র কারখানায় তখন নারী শ্রমিকরা কাজ করত। তাদের দৈনিক ১৫ ঘন্টার বেশি পরিশ্রম করতে হতো। কিন্তু, সে অনুপাতে মজুরি দেয়া হতো না। সুঁচ, সুতা, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক যেসব জিনিসপত্র নারীরা ব্যবহার করত, মালিকরা তার মূল্য বেতন থেকে কেটে রাখত। বিলম্বে ফ্যাক্টরিতে যাওয়া, কাজের ক্ষতি করা অথবা টয়লেটে বেশি সময় নেয়ার জন্য শ্রমিকদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হতো। মালিকদের এ অমানবিক শোষণের বিরুদ্ধে ১৮৫৭-এর ৮ মার্চ নিউইয়র্কের সেলাই কারখানায় নারীশ্রমিকরা উপযুক্ত বেতন, উন্নত কর্মপরিবেশ ও দশ ঘন্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনে নামে। আন্দোলন দমনে পুলিশ সেদিন হাজার হাজার নারী শ্রমিকের মিছিলে গুলি চালায়। এতে আহত ও গ্রেফতার হয় অসংখ্য নারী। ধারণা করা হয়, নারী আন্দোলনের ইতিহাসে এটি ছিল প্রথম গুলি চালানোর ঘটনা। ফলে আন্দোলন আরো জোরদার হয়। পরবর্তীতে, নারীর ভোটাধিকারের বিষয়টি আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে সামনে আসে।

এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আসে ১৮৮৬ সালের মে দিবস। রচিত হয় শ্রমিক দিবসের ইতিহাস। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দিতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ও সর্বহারা শ্রেণির মুক্তি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। একই সাথে বিভিন্ন দেশে শ্রমজীবী নারীদের অধিকার ও দাবি-দাওয়ার জন্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। এসব আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে থাকা নারীরা এবং তাদের নেতৃত্বে এ আন্দোলনসমূহ গতি পেয়েছিল। জার্মান কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেত্রী ক্লারা জেটকিন ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

কে এই ক্লারা জেটকিন? ১৮৫৭ সালের ১৫ জুলাই জার্মানির ছোট্ট একটি গ্রামে ক্লারা জেটকিনের জন্ম। তার মা জেসেফিন ফিটেল আইসনার ছিলেন একজন শিক্ষিত নারী। তিনি ফরাসি বিপ্লবের অবাধ স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে বিশ্বাসী *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

জুম পাহাড়ের কান্না

পাহাড়ের ঝরণা ধারা আজ অনেকটাই শুকিয়ে মৃতপ্রায়। একই অবস্থা পাহাড়ে বাস করা মানুষগুলোর। নিত্যদিনের জীবনে অপমান, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, আতঙ্ক আর মৃত্যুর হাতছানি। সংঘাত-খুনোখুনি যেন লেগেই আছে। জাতীয় এবং আঞ্চলিক রাজনীতির বলি হচ্ছে নিরাপরাধ সাধারণ মানুষ। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তি হয়েছিল। প্রত্যাশা ছিল সংঘাতের অবসান ঘটবে। কিন্তু ২ দশক অতিক্রান্ত হবার পর দেখা যাচ্ছে পার্বত্য অঞ্চল এখন আরও অশান্ত। বহুমাত্রিক সংঘাত জীবনের স্বস্তিটুকু কেড়ে নিয়েছে। বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল। গুম অপহরণ, ধর্ষণ, আগুনে পুড়িয়ে ভূমি উচ্ছেদ তো লেগেই আছে।

সম্প্রতি রাঙামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলায় একটি গ্রামে সেনা অভিযানে দুই মারমা বোনের উপর যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে। সেনাসদস্যরা এর সাথে জড়িত বলে অভিযোগ করা হলেও শুরু থেকে তা অস্বীকার করেছে কর্তৃপক্ষ। পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিবাদ কর্মসূচিগুলোতে বাধা দেয়া হয়েছে। এক পর্যায়ে সেখানকার রানী ইয়ে ইয়েনের উপর বর্বরোচিত হামলা চালানো হয় এবং হাসপাতাল থেকে ধর্ষিতা দু বোনকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রাতের আঁধারে। এর কিছুদিন আগে ইউপিডএফ নেতা মিঠুন চাকমা বাড়ির সামনে খুন হয়েছেন। নয়ন চাকমা, রমেল চাকমাসহ মৃত্যুর মিছিলে যুক্ত হয়েছে আরও অনেক নাম। কিন্তু আজও এর কোনোটির বিচার হয়নি। প্রকৃত অপরাধী ধরা না পড়লেও নিরীহ নিরাপরাধ ব্যক্তিদের হয়রানি হরহামেশা লেগে আছে।

এদেশের রাজনৈতিক নীতিগত সিদ্ধান্তগুলো কখনোই পাহাড়ের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। বৃটিশ শাসন আমল থেকেই শাসকগোষ্ঠী পাহাড়ি জনগণের জন্য বৈষম্যমূলক নীতি-পদ্ধতি, নানা আইনি জটিলতা সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তান পর্ব থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ – কোথাও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। যে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি-পাহাড়ী সকল জনগোষ্ঠীর আত্মত্যাগ ছিল, ১৯৭২ সালের সংবিধানে তার স্বীকৃতি মেলেনি। বাংলাদেশের সকল নাগরিককে 'বাঙালি' পরিচয় দিয়ে বাস্তবে এদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি, জীবনযাপন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষার স্বাতন্ত্র্যকেই অস্বীকার করা হয়েছিল। সেদিন গণপরিষদে তার প্রতিবাদ করেছিলেন এম এন লারমা। কিন্তু শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন সরকার তা মেনে নেয়নি। এরপর নিরাপত্তার নামে পাহাড়ে শত শত সেনা ক্যাম্প বসেছে। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর বাঙালি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পাহাড়ি-বাঙালি দ্বন্দ্বের চিরস্থায়ী রূপ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে মোট ১৬ লাখ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৮ লাখ বাঙালি।

এদেশে পাহাড়ি-বাঙালি মিলেমিশে বাসবাস করত। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগ্রামেও তারা একসাথে লড়াই করেছে। কিন্তু আজ শাসকগোষ্ঠীর নোংরা রাজনীতির চালে সেই সম্প্রীতি-সদ্ভাব বিনষ্ট। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতি মুহূর্তের আশঙ্কা – কখন যেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। পরস্পর অবিশ্বাস-অনাস্থার পরিবেশ বিরাজ করছে। অলিখিত সেনা শাসন চলছে দীর্ঘদিন। অনেকগুলো আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। তাদের নিজেদের মধ্যকার কোন্দল, বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে সংঘর্ষ লেগে আছে। এই আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর সাথে জাতীয় পর্যায়ের দল-সংগঠনের সম্পর্ক আছে। বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

আরজ আলী মাতুব্বর
আলো হাতে চলা আঁধারের এক যাত্রী

'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর' কথাটি শোনেনি এমন মানুষ আমাদের দেশে কম। চারপাশের সমাজ-পরিবেশে এ কথাটিই আমরা শিখি প্রতিনিয়ত – তর্ক করতে নেই, বিশ্বাস করো। ছোটবেলাতেও যে শিশুটি বেশি প্রশ্ন করে তাকে 'বাচাল' বলে আমরা প্রায়ই থামিয়ে দিই। এমন প্রশ্নহীন পরিবেশে কখন যে অনুসন্ধিৎসু-কৌতুহলী মনটা মরে যায়, কেউ তার হদিস পায় না। তাই তো চারপাশে এমএ-বিএ ডিগ্রিধারীদের ছড়াছড়ি হলেও ভাগ্য বা কপালে বিশ্বাস করে না, এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যায়।

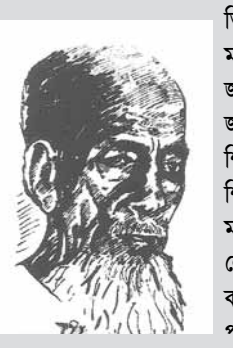

বিশ্বাসের এমন বদ্ধতা আমরা অনেকেই অতিক্রম করতে না পারলেও পেরেছিলেন দূর পাড়াগাঁয়ের 'অশিক্ষিত' এক মানুষ। আজকাল শিক্ষা যে ডিগ্রি আর সার্টিফিকেটের মাপকাঠিতে দেখা হয়, সেটা তাঁর ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণির উপরে উঠতে পারেননি। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত মানুষরা যা পারে না, স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন এক উন্নত স্তরে তিনি উঠেছিলেন যা দেখলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। সমাজ আর মানুষের প্রতি প্রবল দায়বোধ আর জ্ঞান সাধনার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ – এই মানুষটিকে উন্নীত করেছে এদেশের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক দার্শনিকের আসনে। আজ সেই মানুষটিরই গল্প শুনবো আমরা, তবে খুব ছোট্ট পরিসরে।

আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর নাম। বরিশাল শহরের অদূরে লামচরি গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম ১৯০০ সালের ১৭ ডিসেম্বর। শৈশবেই তিনি বাবাকে হারিয়ে ছিলেন। বাবা মারা গেলে খাজনার দায়ে কৃষি জমিটুকু নিলাম করিয়ে নেন লাখুটিয়ার জমিদার। সেসময় গ্রামে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। শরিয়তি শিক্ষালাভের জন্য এক মুন্সি সাহেবের মক্তবে কিছুদিন অবৈতনিকভাবে লেখাপড়া করেছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে মক্তবটি বন্ধ হয়ে গেলে তাঁরও পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। মক্তবেই তিনি স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ শেখেন। বই, শ্লেট কেনার সঙ্গতি ছিল না। তালপাতা-কলাপাতাতেই অক্ষর লেখা শিখেছিলেন। প্রবল দারিদ্র্যের পরও পড়ালেখার প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ দেখে এক আত্মীয় 'বাল্যশিক্ষা' নামের একটি বই কিনে দেন। এই বইটিই ছিল তাঁর বাল্যশিক্ষার একমাত্র সম্বল। কতটা খুশি হয়েছিলেন বোঝা যায়, "সেদিন ছিল আমার জীবনের সর্বপ্রথম বই হাতে ছোঁবার দিন। তাই আনন্দে আমার মনটা ফেটে যাচ্ছিল, ... সে বইখানা ছিল আমার ক্ষুধার্ত মনের খাদ্য।"

এরপর তাঁর পড়াশুনা আর খুব বেশি অগ্রসর হয়নি। দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার প্রবল ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org